পদশব্দ

(১৯৮২)

সেলিনা হোসেন

রোজ ভোরে সালমার ঘরে প্রজাপতি আসে

রোজ ভোরে সালমার ঘরে প্রজাপতি আসে। এক এক দিন এক এক রঙের। কখনো সাদা দেয়ালের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণটায় চুপচাপ বসে থাকে, কখনো ঘরময় উড়ে বেড়ায়। তখন সালমার ঘুম ভেঙে যায়। বালিশট বুকের তলে চেপে উপুড় হয়ে পা নাচায় আর প্রজাপতি দেখে। রঙিন প্রজাপতি। চমৎকার রঙে চিত্রিত ডানা। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়। সালমা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে, তুমি আমার বন্ধু। আমার ইচ্ছেগুলো ঠিক তোমারই মতো রঙিন। কেবল তোমার মতো উড়াল দিতে পারি না, এই যা। এ কী আমার কম দুঃখ! ঘুরে ঘুরে একসময়ে প্রজাপতিটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাগানের বোগেনভিলার ঝোপে গিয়ে বসে। রঙে রঙে মিলে যায়। সালমা আর দেখতে পায় না। বালিশে মুখ গুজে চুপচাপ শুয়ে থাকে। পাশের ঘর থেকে ছোট ভাই সাকিবের স্প্যানিশ গিটারের সুর ভেসে আসে। মৃদু। সাগরপারের গানের মতো ফিসফিসানি যেন। সালমার বুকের তল টিপটিপ করে। দরজায় সবুজ পর্দা কাঁপে। কাঠ-বোঝাই নৌকার মতো সালমার ঘরটা আস্তে আস্তে বিরাট এক রোদ-বোঝাই নৌকা হয়ে যায়।

সালমা শুয়ে শুয়ে শোনে দোতলার ঘরে হাঁটাচলার শব্দ। নাসিমা আপা উঠেছে। বোধহয় তৈরি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্য। নাসিমা আপার কথা উঠলেই সালমার মনটা টানটান হয়ে যায়। ধুৎ, পাপ বুঝি না। পাপ আবার কী? মানুষ যতক্ষণ নিজের বিবেকের কাছে অপরাধী নয় ততক্ষণ কোনো পাপ নেই। আসলে পাপ-পুণ্য নামক বায়বীয় শব্দগুলো অভিধান থেকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। কেনো এই শব্দ দুটো নিয়ে ভাবনা করতে গেলে সালমা কেমন তলিয়ে যেতে থাকে জলে-ডোবা মানুষের মতো।

হাজার চেষ্টা করেও আর ভেসে উঠতে পারে না। তখন বাবার মুখ মনে পড়ে। আস্তে আস্তে বাবার মুখটা এক তিমি মাছ হয়ে যায়। সালমা শেষ তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরার মতো চিৎকার করে ওঠে, বাবা, তুমি পাপের যে সংজ্ঞা দাও তা আমি বুঝি না। আমার মাথা ঘোলাটে হয়ে যায়। কেমন ম্যাজম্যাজ করে স্নায়ু। আমি কোনো বোধ হাতড়ে পাই না। বলো তুমি, তোমার মেয়ে সালমা আমি। তোমার আর মার ভাষায় একরত্তি মেয়ে। পৃথিবী সম্পর্কে কিছু বুঝি না। তবু কেন তোমার জ্ঞানের তলায় এত অন্ধকার দেখি, বাবা?

স্প্যানিশ গিটারের আওয়াজ এবার দ্রুত আসছে। সালমা চঞ্চল হয়। চমৎকার বাজায় সাকিব। ওর এই একটা গুণ আছে। সালমা কান পেতে থাকে। আওয়াজটা কেমন নেচে নেচে আসছে। মনে হয়, কোনো এক বিরাট আঙুর ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসছে। আঙুরের টক-মিষ্টি স্পর্শ নিয়ে। মাতাল মাতাল স্বাদ। (আঃ, কেমন অবশ হয়ে আসে। ওই আওয়াজটার মতো সালমার সমস্ত জীবনটা যদি টক-মাতাল গন্ধে ভরপুর হয়ে থাকত! আর বিষণ্ণ হয়ে যায় ও। এবার কেমন ঢিমেতালে শব্দ আসছে। সমুদ্রের বুকে ক্লান্ত পাখির মতো। বুকে একটা ব্যথা হয় প্রায়ই। একটা ব্যথা টের পায় ও। আর ওই ব্যথা উঠলেই রাগ হতে থাকে। বালিশগুলো ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর। দ্রুতলয়ের বাজনার মতো ব্যথাটা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। সালমা খাটে বসে স্যান্ডেলে পা গলায়। স্প্যানিশ গিটার থেমে গেছে। ওর ঘর থেকে রোদ সরে গেছে। ঝিম ধরে আছে চার দেয়াল। মা একবার ডেকে গেছে। সালমা ওঠেনি। আবার ডাকছে। সালমা চুপচাপ বসে থাকে। সাড়া দেয় না। মাঝে মাঝে ওই কণ্ঠ ভীষণ কর্কশ লাগে। দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর জল্লাদের মতো। মা এবার দরজা ধাক্কা দিচ্ছে।

লিমা। ও লিমা?

আমি উঠেছি।

ক্লাসে যাবি না? নটা বাজে।

বাজুক। যত খুশি বাজুক। আমি ক্লাসে যাব না।

দরজা খোল না! দেখি শরীর খারাপ কি না?

আমি ঠিক আছি। তুমি যাও।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তার বাবা বসে রয়েছে তোর জন্য।

বাবাকে খেয়ে নিতে বলল।

মা এবার রেগে যায়।

কেমন মেয়ে যে পেটে ধরেছি বাবা! আমার সাতজন্ম উদ্ধার করে ছাড়ল।

মা দুপদাপ চলে যায়।

সালমা বিনুনি খুলে মাথা আঁচড়ায়। সারারাতে বালিশের ঘষায়। চুলগুলো কেমন পাকিয়ে যায়। সকালে উঠে ঠিকমতো না আঁচড়ালে আর রক্ষা নেই। সালমা জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। মা ওকে নাসিমা আপার বাসায় যেতে দেয় না। নাসিমাকে বিশ্রী ভাষায় গালি দেয়। ওপরের রুম দুটো বাড়িওয়ালা কেন নাসিমাকে ভাড়া দিয়েছে এ জন্য বাড়িওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করেছে মা। নাসিমা চুপচাপ। কিছু বলে না। নোংরা কথাও বলে না। সালমাকে দেখে হাসে। ঝকঝকে দাঁতের হাসি। বড় বড় টানা চোখ নামিয়ে বলে, কেমন আছিস সালমা? নাসিমার ওইটুকু কথায় বিগলিত হয়ে যায়

সালমা। মাথা ঝাঁকিয়ে বড় করে উত্তর দেয়, ভালো। মার অবর্তমানে চুপে চুপে নাসিমার বাসায় যায়। চেঞ্জারে গান শোনে। কী যেন একটা আছে নাসিমার মধ্যে। কিছু একটা অসাধারণ। কিন্তু সেটা কী ধরতে পারে না সালমা। কিসের আকর্ষণ? বড় বড় চোখের? গোছ গোছা চুলের? ঝকঝকে দাঁতের? নাঃ, সব মিলেয়ে কিছু একটা, যা সালমা ধরতে পারে না। আর ধরতে গেলেই সালমার মাথা ঘোলাটে হয়ে যায়। তখন নাসিমা আপার মুখটা মুছে গিয়ে বড় একটা গোলাপ ফুল ভেসে ওঠে। লাল টকটকে গোলাপ। রেড রোজ। সালমা বিড়বিড় করে। সত্যি, নাসিমা একটা রেড রোজ। চমৎকার রেড রোজ, যেমন সুগন্ধি, তেমন আকর্ষণীয়। নাসিমার গুণের শেষ নেই।

মা নাসিমাকে দেখতে পারে না। কেনো নাসিমা প্রচলিত সংস্কারের বেড়ি ভেঙেছে। তাই মার যত রাগ। সালমা জানালার কাছ থেকে সরে এসে খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে। হাঁটুর ওপর থুতনি রাখে। বাবা ক্লাসে যাবে। সাড়ে নটায় ক্লাস। বাবা দর্শনের অধ্যাপক হলে কী হবে, বাবা একদম ছেলেমানুষ। বাবা যখন ইচ্ছে করে একটা সত্যকে এড়িয়ে যেতে চায় তখন রাগ হয় সালমার। শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বাবা নিয়মের অনেকটা বেমালুম হজম করে দিতে পারে। বাবার কোথাও বাধে না। মাও তাই। নিজস্ব গণ্ডির বাইরে মার কোনো ভাবনা নেই। ভাবতে গেলে স্বার্থ নামের নরম পনিরের একখণ্ড যদি ছুটে যায়। যদি হাতছাড়া হয়। আর সহ্য হয় না। হাউকাউ করে ওঠে। যেন হৃৎপিণ্ডের এক অংশ কেউ খুলে নিয়ে গেছে। মা অধ্যাপক গিনি। নিজে মেয়ে স্কুলের টিচার। মনে অহংকার। দেশের সেবায় নিয়োজিত আছেন। সালমা একলা ঘরে বসে ভেংচি কাটে। সেবা না কচু! ব্যাঙের ছাতা! দরজার মৃদু টুকটুক শব্দ হয়।

দিদিভাই?

সাকিব? দাঁড়া খুলছি।

মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সালমার। সাকিব আর ও মাত্র এক বছরের ছোট-বড়, অথচ সাকিবকে এখনো গাল টিপে আদর করতে ইচ্ছে করে। সালমার। ও নরমসরম। বাচ্চা পায়রার মতো। ভঙ্গিটা খুব সাবমিসিভ।

এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছিস দিদিভাই?

কই ঘুমোচ্ছি? শুয়ে শুয়ে তোর গিটারের বাজনা শুনেছি।

কেমন লাগল?

মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি।

সত্যিই?

হ্যাঁ রে সত্যি। চমৎকার হাত তোর যত শুনি তত ভালো লাগে।

জানিস দিদিভাই, মিতালিও তাই বলে।

মিতালি?

ও সালমার বিস্ময়ে সাকিব একটু লজ্জা পায়। ঘাড় কঁকিয়ে বলে, মিতালি আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়ি।

ও!

সালমা আর কৌতূহল দেখায় না। তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢোকে।

মা তোর ওপর খুব ক্ষেপেছে দিদিভাই।

ক্ষেপুক। কিছু যায় আসে না।

তুই বেশি বেপরোয়া।

সালমা কথা না বলে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে। একটানা জল পড়ার শব্দ হয়।

সাকিব জানালা দিয়ে বাগান দেখে। দিদিভাইটা এমনি। কাউকে মানতে চায় না। আর সাকিব ইচ্ছে করলেও পারে না। ঘুরেফিরে আবার সেই একই জায়গায় এসে যায়।

অকারণে পথ হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে ছাউনিতে ফেরে। দিদিভাই বড় শক্ত। ক্লান্ত হলেও গণ্ডিতে ফেরে না। নতুন ছাউনি খোঁজে। বাগানের গেট খুলে নাসিমা বেরিয়ে গেল। নাসিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলজি পড়ায়। চমৎকার লেকচার দেয়। সাকিব তন্ময় হয়ে শোনে। ও সাইকোলজির ছাত্র। ফার্স্ট ইয়ার অনার্স ক্লাসে নাসিমার লেকচার ঝিরঝিরে নীল বরফপাতের মতো মনে হয় সাকিবের। যেমন উচ্চারণ তেমন বলার ভঙ্গি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ছিল নাসিমা। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কেবল কাগুজে ডিগ্রি নয়, বিষয়ের ওপর চমৎকার দখল আছে নাসিমার। মনস্তত্ত্বের ওপর যখন পড়ায় তখন মনে হয় নাসিমা আপার সমগ্র জীবনটা বুঝি মনস্তত্ত্বের বিষয়। ছোটখাটো জিনিসকে চমৎকার বিশ্লেষণ করতে পারেন তিনি। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা সে বিশ্লেষণের ধার বাড়াতে পারে না। গভীর কিছু অভিজ্ঞতা সে জ্ঞানকে পূর্ণতা দেয়। অন্তত সাকিবের তাই মনে হয়। সমুচ্ছ্বসিত মন নিয়ে গেটের দিকে তাকিয়ে থাকে সাকিব। আজ নাসিমার সঙ্গে ওর কোনো ক্লাস নেই। হিলতোলা জুতায় খুটখুট শব্দ তুলে নাসিমা যাচ্ছে। হাত দিয়ে ডেকে রিকশা থামাল। হাতে বড় ভ্যানিটি ব্যাগের সঙ্গে ভাঁজ করা ছোট গোলাপি ছাতা। কৃষ্ণচূড়ার লম্বা ছায়া ডিঙিয়ে রিকশাটা বেরিয়ে গেল। একটু পরে সাদা ড্যাটসান গাড়ি নিয়ে বাবা বেরোলো। মুখে পাইপ। পাইপ ছাড়া থাকতে পারে না বাবা। দর্শনের ওপর যখন বড় বড় প্রবন্ধ লেখে তখনো সারাক্ষণ মুখে পাইপ থাকে। সাকিব মনে মনে হাসল, বুদ্ধিজীবী হিসেবে বাবার খুব নাম। চমৎকার বক্তৃতাও দেয়। ও মাঝে মাঝে অবাক হয়। এমন সাজিয়ে কেমন করে বলে বাবা!

বাথরুম থেকে দিদিভাইয়ের গান ভেসে আসছে। অবশ্য গান নয়, গুনগুনানি, হঠাৎ কখনো গলা ছেড়েও দিচ্ছে। সাকিব ভাবল, দিদিভাইটা বড় খেয়ালি। ওর একটা নিজস্ব গণ্ডি আছে। ওখানে ও আপনমনে সুখ-দুঃখ সাজায়। সাকিবের তেমন কোনো নিজস্ব কিছু নেই। সাকিব জলে সাঁতরানোর মতো সবকিছু কাটিয়ে যেতে পারে। কোথাও বাঁধে না। দিদিভাই পারে না। দিদিভাই ঘাসেও হোঁচট খায়। আর হোঁচট না খেয়ে চলতে গেলে ওর মনে হয় ও থেমে গেছে। চলতে পারছে না। সোজা পথে চলাটা কি চলা নাকি!

সাকিব হাসে। দিদিভাইটা সত্যি পাগল। এজন্যেই ওকে এত ভালো লাগে। আসলে ও কোথাও নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। আর পারছে না বলেই আশপাশের সবকিছুর ওপর ওর যত রাগ। যত বিতৃষ্ণা। এমনকি বাবা-মার নরম ভালোবাসাও সহ্য হয় না। বলে, বাবা-মা আমাকে করুণা করে। কেন করবে? জন্ম দিয়েছে বলেই আমার সব দায়দায়িত্ব তাদের নাকি? কে বলে আমাকে নিয়ে এত ভাবতে? তুই ওদের বলে দিস সাকিব, এসব আমার ভালো লাগে না।

সাকিব ঘরে ফিরে খাটের কাছে আসে। চাদরটা গোছায়। মেঝের ওপর থেকে বালিশ দুটো কুড়িয়ে এনে গুছিয়ে রাখে। বেড কভার দিয়ে ঢেকে দেয় বিছানাটা।

তারপর দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যালেন্ডার দেখে। রাশিয়ান ক্যালেন্ডার। প্রতিটি পৃষ্ঠায় বাচ্চার ছবি। চমৎকার স্বাস্থ্যবান বাচ্চা। দেখতে ভালো লাগে। হাসি-খুশিতে ফেটে পড়ছে যেন। একটা পৃষ্ঠায় এসে থমকে যায় সাকিব। বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ ঝলমল করছে। সাকিব মনে মনে ভাবে, এমন এক জোড়া চোখ আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে সালমা। সাদা তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল মাথার ওপর জড়ানো। পাড়-ছাড়া নীল শাড়ি পরেছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সাকিব আনমনা হয়ে যায়। অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে সালমার দিকে।

কিরে, হাঁ করে কী দেখছিস?

তোকে দিদিভাই।

কেন?

দেখ, ঠিক এমন একজোড়া চোখ আমি খুঁজছি। তোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। না, মিলছে না।

সালমা শব্দ করে হাসে। বারান্দার তারে ভিজে কাপড় মেলে দেয়। বাগানে জলিল কলাবতীর ঝোপ পরিষ্কার করছে। শুকিয়ে যাওয়া মরা পাতাগুলো টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে। বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছে ঝোপটাকে। সালমা পায়ে পায়ে বাগানে নেমে আসে। সামনে-পেছনে দুটো বাগান আছে বাড়িটার। এজন্যে বাবা বাড়িটা খুব পছন্দ করে।

ভাড়া বাড়িয়েছে। তবু ছাড়ে না। সামনে ফুলের বাগান, পেছনে ফলের। একটা আঙুর গাছও আছে। টক আঙুর। সালমা কলাবতীর ঝোপটার সামনে এসে দাঁড়ায়। ওই ঝোপটা পরিষ্কার করার কী অর্থ জলিলের মনে আছে? সেটা জানতে ইচ্ছে করে।

এই ঝোপটা সাফ করছ কেন জলিল ভাই?

জলিল মিয়া অবাক হয়ে তাকায়।

কেন আবার, দেখছ না কেমন নোংরা হয়েছে।

নোংরা হলে কী হয়?

অতশত বুঝি না বাপু। তোমার বাবা বলেছে সাফ করতে।

ও, বাবা বলেছে বলে তুমি করছ।

সালমা একটু হতাশ হয়ে সরে আসে। জলিলকে আর ঘটায় না। ওর মেজাজটা একটু খিটখিটে। বেশি কথা বললে রেগে যায়। কামিনী ফুল গাছটার নিচে এসে দাঁড়ায় সালমা। ছোট্ট দুটো টুনটুনি পাখি ডালে ডালে লাফায়।

বুড়োদের নিয়ে যত জ্বালাতন!

কথাটা সালমা সবসময় বলে। ওর মতে, ষাট বছরের ওপরে আর কাউকে বাঁচতে দেওয়া উচিত না। এর মধ্যে কারো যদি স্বাভাবিক মৃত্যু না হয় তবে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা দরকার। বাবা-মা ওর কথায় রাগ করে। আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হয়। হলে

কী হবে, সালমা অন্য কারো কথা মানতে রাজি নয়। ওর মতে প্রত্যেকেরই প্রচলিত ধারণাগুলো কিছু না কিছু বদলে ফেলা প্রয়োজন। তা না বুড়োগুলো পারে কেবল আঁকড়ে থাকতে। কোনো কিছু ভাঙতে হবে ভাবলে বুকটা ফেটে যায় ওদের। তাছাড়া বুড়ো বয়সটাও খারাপ। নতুন করে কিছু ভাবতে পারে না। এই যেমন জলিল মিয়া। খুব একটা বুড়ো হয়নি। তবু নিজের কোনো চিন্তা নেই। বাবা বলেছে বলে ঝোপটা পরিষ্কার করছে, আর কিছু ভাবতে পারছে না।

লাল রঙের একটা ফড়িং সালমার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। ও কামিনীর পাতা ছিড়ে হাত দিয়ে টুকরো করে। আসলে কিছু করার জন্য হাতটা নিশপিশ করে। জলিল মিয়া হাত-পা ছড়িয়ে ঘাসের ওপর বসে আছে। অল্প একটু কাজ করতে গেলেই হাঁপিয়ে ওঠে। সালমা ঘুরেফিরে আবার জলিলের কাছে আসে। স্যান্ডেল খুলে ঘাসের ওপর বসে।

আচ্ছা জলিল ভাই, কলাবতীর ঝোপটা পরিষ্কার করতে করতে তোমার কী মনে হয়েছে?

জলিল ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকে। কী যেন ভাবে। কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে চিরল রোদ এসে পড়েছে ওদের গায়ে। কলাবতীর মরাপাতার স্তুপের ওপর একটা হলুদ প্রজাপতি। জলিল বিড়ি বের করে ধরায়। সালমার সামনে ওর কোনো সংকোচ নেই। সালমার জন্মের আগে থেকে এ-সংসারে আছে ও। বিয়ের পরই সালমার বাবা ওকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। তারপর থেকে জলিল মিয়া অন্য কোথাও যায়নি। সালমা কিছুক্ষণ জলিলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বয়সের চিহ্ন পড়েছে চেহারায়। রেখাগুলো স্পষ্ট। কালো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে চিকন বিড়ি। কপালের ওপর থেকে অনেক চুল উঠে গেছে। অসম্ভব ঘোট চোখজোড়া প্রায় গর্তে ঢোকানো।

আমার কথার উত্তর দিচ্ছে না কেন জলিল ভাই?

সালমা একটু ধমকের সুরে কথা বলে। ওই লোকটার বুকের ভেতর কী ভাবনা তা ওকে জানতে হবে। করতোয়া নদীর পাড়ে বাড়ি ওর। অনেক দিন খেয়া পারাপারের কাজ করেছিল। এর বেশি কিছু সালমা জানে না। তবু লোকটাকে আজ জানতে হবে সালমার। ওকে বয়সে ধরেছে। ও এখন পৃথিবী সম্পর্কে বেশি কিছু ভাবতে চায় না। কিন্তু একদিন তো ওর যৌবন ছিল। সেই যৌবনের রেশ কি মনের কোথাও নেই? উত্তর

দিতেই হবে সালমাকে। সালমা আজ ওকে ছাড়বে না। প্রায় ফিসিফিসিয়ে বলে, তুমি কী ভাবছ জলিল ভাই?

ভাবছি আমারও দিন ছিল আপামণি। বয়স থাকতে সেইসব দিন সাফ করিনি। এখন দেখি চারদিকে কেবল মরাপাতার বোঝ।

সালমার বুকটা ধক করে ওঠে। একটা মানুষের গোপন গুহার চিচিং ফাঁক হয়েছে ওর সামনে। হ্যাঁ, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গুপ্তধন থাকে। নিরক্ষর জলিল মিয়াও তার বাইরে নয়। সালমা একটুক্ষণ চুপ থাকে। জলিল মিয়ার বিড়ি নিভে আসছে। চিরলপাতার ফাঁকে রোদ গরম হচ্ছে। এই লোকটাকে এক্ষুনি না ধরলে ও হয়তো পালাবে। আবার নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাবে। ওকে এখনই ধরা চাই।

তুমি বিয়ে করোনি কেন জলিল ভাই?

বিয়ে? জলিল মিয়া হলুদ দাঁত মেলে হাসল। দিন থাকতে এক হিন্দু। বিধবা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম।

জলিল মিয়া আর একটা বিড়ি ধরায়।

বিয়ে হলো না কেন?

ও রাজি হলো না।

কেন?

সংস্কার।

সেই থেকে তুমি বিরাগী হলে? তুমি একটা পাগল।

জলিল মিয়া উত্তর দিলো না।

সালমা ভাবল, মনের মধ্যে এইসব আবর্জনা জমাতে নেই। জমালে ওই বোঝায় চাপা পড়ে মরতে হবে। নির্ঘাত মৃত্যু।

ওর নাম কী ছিল জলিল ভাই?

বরদা।

জলিল মিয়া উঠে চলে যায়। বসলে হয়তো সালমার আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এবং সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ও রাজি নয়। জলিল মিয়া বোঝা বাড়িয়েছিল কিন্তু ভার বইতে পারেনি। বরদা? ভালোবাসার নাম বরদা। ব-র-দা। সালমা টেনে টেনে উচ্চারণ করে। করতোয়া পাড়ের ছেলে খেয়া বাইত। খেয়া বাইতে বাইতে নিজেই ডুবে গেছে। কাকে আর পারাপার করবে ও?

সালমা বসে বসে ঘাসের ডাটা ছেড়ে। এখনো অনেক বাকি। ওই লোকটাকে আরো বেশি করে জানতে হবে। দেখবে কোন সমুদ্রে ওর ঠাঁই। কেমন করে দিনকাল পেরিয়ে অবলীলায় পাড়ি দিলো করতোয়ার উতল স্রোত? কলাবতীর ঝোপটা বেশ দেখাচ্ছে। কচি সবুজ পাতাগুলো আরো উজ্জ্বল। লাল-হলুদ ফুলের রোশনাই বেড়েছে। আসলে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত জিনিস দরকার। বোঝা বাড়ালে সব ম্লান হয়ে যায়। ম্রিয়মাণ দেখায়। সব বাজে ভাবনা ঝেড়ে ফেলে অমন হালকা ফুরফুরে হয়ে যেতে ইচ্ছে করে সালমার।

অ্যাই লিমা?

বারান্দার ওপর থেকে মা ডাকছে। স্যান্ডেলে পা ঢুকিয়ে দাঁড়ায় ও। মা স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছেন। কালো কাজ করা হলুদ শাড়ি পরেছেন। মাথায় প্রজাপতি খোপা। ঠোঁটে হালকা রং। হাতে ব্যাগ। সালমা আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়ায়। মার মুখ গম্ভীর।

ক্লাসে যাবে না কেন?

ভালো লাগছে না।

শরীর খারাপ?

না।

তবে?

ইচ্ছে করছে না।

এইসব খামখেয়ালি ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো কবে তোমার শেষ হবে বলতে পারো?

কোনো দিনও হবে না।

ফিক করে হেসে ফেলে সালমা। মা আর কথা বাড়ায় না।

নাশতা খাও গিয়ে। দশটা বাজে।

যাচ্ছি।

মা বেরিয়ে যায়। আসবে বিকেল চারটায়। সালমা খাবার ঘরে এসে ঢোকে। টেবিলের ওপর থেকে এক টুকরো পনির তুলে মুখে দেয়। হান্টার বিফও আছে দেখছি। এই জিনিসটা সালমার খুব প্রিয়। মা ওর জন্য প্রায়ই তৈরি করে। ও কী খেতে ভালোবাসে তার দিকে মার খুব নজর। তবু মার প্রতি তেমন কোনো নিবিড় আকর্ষণ খুঁজে পায় না। সালমা।

আপনাকে চা দেব আপামণি?

দাও।

কুন্ঠিত ভঙ্গিতে বেরিয়ে যায় আনুর মা। সালমার মনে হয় একেও জানতে হবে। দেখতে হবে এর ভেতরে কী আছে। আজ সকাল থেকে চারপাশের মানুষগুলোকে কেন জানি নতুন করে দেখতে ইচ্ছে করছে সালমার। প্রত্যেকেরই একটা জগৎ আছে। সালমার নিজস্ব নিয়মের মতো মানুষগুলো বুঝি ঘুরছে। হান্টার বিফের টুকরোগুলো শেষ করে ফেলে ও। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। অথচ এক এক সময় পাগলের মতো খেতে ইচ্ছে করে। যা পাওয়া যায় তাই খেতে ভালো লাগে। আনুর মা চা নিয়ে আসে। কাপটা টেবিলের ওপর রেখে টেবিল পরিষ্কার করতে লেগে যায়। আজ একটা চিকন পাড়ের বেগুনি শাড়ি পরেছে ও। জায়গায় জায়গায় ময়লার দাগ। আনু নামের একটা মেয়ে আছে ওর। বিয়ে দিয়েছে। আনুর মা একটু অবাক হয়।

কী দেখেন আপামণি?

কিছু না।

সালমা চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বারান্দায় আসে। সিঁড়ির ধারে বসে। সাকিব গুনগুন করে গান গাইছে আর ইউনিভার্সিটি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। পড়াশোনায় ওর খুব একটা আগ্রহ নেই। গান-বাজনায় ঝোঁক। গিটার নিয়ে বসলে আর সব কাজ ভুলে যায়। মাঝে মাঝে সাকিব অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে গিটার বাজায়। তখন ঘুম আসে না সালমার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। মনটা ছটফট করে। মনে হয় ওর চারদিকে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে। আর ওর পৃথিবী ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। ও একটা ছোট নিঃসঙ্গ দ্বীপের অচিন পাখি হয়ে গেছে। কোথাও যেতে পারে না। পুল ভেঙে গেছে–খেয়া ডুবে গেছে–ডানায় শক্তি নেই। আর তখনই ও বুকের তলে। বালিশ আঁকড়ে ধরে। একটা কিছু অবলম্বন চাই। একটু কিছু। মাঝে মাঝে ভয় হয় সালমার। মনে হয় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ও অনবরত ভূমিতলস্থ অন্ধকারে চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। চলার শেষ নেই। সামনে পেছনে ডানে বামে কেউ কোথাও নেই। আলো নেই। বাতাস নেই। ও যেন এক ফোঁটা আলো আর বাতাসের জন্য মরে যাচ্ছে। তখন চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে যে, আমি হারিয়ে যাচ্ছি। আমাকে খুঁজে নাও। টেনে তোলো। পথ দেখাও, কিন্তু কেউ আসে না।

সালমা জানে ওর বুকের এই নিঃসঙ্গতা ভরিয়ে দেবার ক্ষমতা কারো নেই। কেন এমন লাগে? এমন অদ্ভুত একপেশে যন্ত্রণা। কখনো নীলপাখি হয়। কখনো রঙিন প্রজাপতি অথবা কখনো সাকিবের গিটার হয়ে যায়।

মাঝরাতে সাবিকের গিটারটা যখন সমস্ত বাড়ি গ্রাস করে তখন সালমার একাকিত্ব তীব্র হয়। তখন বিছানা ছেড়ে উঠে আসে, সাকিবের পাশে চেয়ার নিয়ে বসে।

দেখে বাগান চুপ। সিঁড়ি চুপ। সব আস্তে আস্তে তলিয়ে যায়। সালমার তখন রকিবের কথা মনে হয়। রকিব যতই ওকে ভালোবাসুক, সেই ভালোবাসা সালমাকে স্পর্শ করে না। সালমার স্নায়ুকে সাকিবের গিটারের মতো বাজায় না। রকিবকে তখন একঘেয়ে বিরক্তিকর মনে হয়। সালমার আপন ভুবন ভীষণ ক্লান্তিতে নিশুপ পড়ে থাকে। সাকিবের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে। অন্ধকারে তেমন পরিষ্কার দেখা যায় না। তবু মনে হয় ওই হাত যদি হৃৎপিণ্ডের তারকে এমন ঝংকারমুখর করে তুলতে পারত? কখনো বাড়ি বাগান সব মুছে গিয়ে এক বিরাট সমুদ্র জেগে ওঠে। হাত-পা শিথিল করে দিয়ে অথৈ পানিতে ভাসতে ভাসতে অনেক দূরে চলে যায় সালমা। রঙবেরঙের মাছ ঘুরে বেড়ায় চারদিকে। লাল সাদা সোনালি সবুজ হলুদ। কত বিচিত্র রঙের মাছ! মায়াবী এক জগতের মতো জনে হয় সবকিছু। নিঃসঙ্গ চেতনার পলেস্তারা কেটে যেতে থাকে ভেসে ওঠে নতুন জগৎ। সাড়া জাগানো। শব্দময়। সালমা তখন অতিরিক্ত একটা কিছু খুঁজে পায়। খুঁজে পায় আলোর ফোয়ারা। নিষিদ্ধ বাতাসের ঘ্রাণ। আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যায় সেই প্রত্যয়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে সহস্র কন্ঠে বলতে ইচ্ছে করে, আমি আছি। আমার অস্তিতের বাইরে আর কোনো মৌল সত্য নেই। সেই চেতনা সালমাকে উল্লাসের পরীর নাচ দেখায়।

প্রায়ই অনেক রাত হয়ে যায়, তবু ঘুম আসে না। গাঢ় রাত বাবা-মার নিশ্বাসের মতো গভীর হয়। সাকিবের বাজনা মৃদু হতে হতে থেমে যায়। কামিনীর ঝোপ থেকে পাখির ডানা ঝাপটানি ভেসে আসে। বারান্দার নিচ দিয়ে ইঁদুর চলে যায়।

দিদিভাই?

সাকিব আস্তে আস্তে ডাকে। জোরে ডাকার সাহস নেই।

অ দিদিভাই?

কী।

ঘুমাবি না?

তুই থামলি কেন সাকিব?

ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম? এরপরও তোর ঘুম পায়? ওই বাজনাই তো তোর ঘুম।

অতশত বুঝি না।

তোকে আমার মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

ওঠ, উঠে ঘরে যা।

তুই আর একবার বাজাবি সাকিব?

না।

কেন?

ইচ্ছে করছে না।

তাহলে থাক।

সালমা শ্লথ পায়ে ঘরে চলে আসে। কিছুতেই আর ঘুম আসতে চায় না। এজন্যে কয়েকদিন সাকিবকে মারতে গিয়েছিল ও। রাগে-দুঃখে ওর গিটার ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল। সাকিব শান্ত বলে ব্যাপার বেশিদূর গড়ায়নি। তবে এরপর দুদিন সাকিব সালমাকে না বলে নিঃশব্দে উঠে চলে গিয়েছিল। আর সারারাত সালমা বারান্দার চেয়ারের ওপর ঘুমিয়েছিল। ও টের পায়নি যে কখন সাকিব বাজনা থামিয়েছে। নিমজ্জিত চেতনার তলদেশ থেকে ফিরে না এসে ও আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় দিন সালমাকে ওই অবস্থায় বারান্দায় দেখে মা ভীষণ রাগারাগি করেছিল। এত বড় মেয়ে সারারাত বারান্দার চেয়ারের ওপর। কাটিয়েছে! মা ভাবতেই পারে না নিজের কপালকে ধন্যবাদ দিয়েছিল যে, কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। বাবাও মুখ গম্ভীর করেছিলেন।

সালমা মনে মনে হেসেছিল। দুর্ঘটনা ঘটলেই বা কী হতো? প্রতিটি মানুষই তো এক একটি ঘটনার শিকার। ঘটনার বাইরে কি কেউ থাকতে পারে? মানুষের সমস্ত জীবনটাই তো একটা ঘটনা। আর ঘটনা ঘটানোর মধ্য দিয়েই নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে–অপরিচিত অজানা বিশ্বকে নিজের কাজের মাঝে পরিচিত এবং অর্থপূর্ণ করা যায়। নিজের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়েই তো মানুষ ঘটনা ঘটায়। এই যেমন নাসিমা আপা। বাবুই পাখির মতো চমক্কার এক ঘটনার বাসা বুনে তার মধ্যে ডুব দিয়ে আছে। কারো তোয়াক্কা করে না। নিজস্ব মূল্যবোেধ বিশ্বাসী। তাতে কার বা কী এসে গেল? সালমার বাবা-মা নৈতিকতার দোহাই দিয়ে যত চেঁচাক, সালমার মনে হয় নাসিমা আপা একটা কিছু করতে পেরেছে। অন্তত নিজের ইচ্ছেমতো জীবনের শুকনো ডাল থেকে রস নিংড়িয়ে নিচ্ছে। আর এই ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাটাই তো এ সমাজের বড় দায়।

কাঠের গেটে মৃদু শব্দ করে সাব্বির ঢোকে। সাদা টেট্রনের প্যান্ট-শার্টে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। সাব্বির নাসিমার বন্ধু। সালমার সঙ্গে আলাপ আছে। সাব্বিরকে দেখে উঠে দাঁড়ায় সালমা।

কেমন আছেন সাব্বির ভাই? ভালো। তুমি? ভালো।

চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে বাম দিকের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়। দুটো সিঁড়ি একসঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। সালমার মনে হয় বিলেতি খরগোশের মতো। নিজে নিজেই ফিক করে হেসে ফেলে। আবার ধপ করে সিঁড়ির ওপর বসে পড়ে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে যে, সাব্বির এখন কী করছে? তালা খুলে ঘরে ঢুকেছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছে। ফ্রিজ খুলে এক টুকরা কেক মুখে দিয়েছে। বোতলের মুখেই পানি খাচ্ছে। সাব্বির ভাইয়ের এই এক অভ্যেস। নাসিমা আপা মাঝে মাঝে রাগ করে।

তোমাকে কিছুই শেখানো গেল না সাব্বির।

আমি এমন বনমানুষই থাকতে চাই নাসিমা। বেশি সভ্য হয়ে লাভ কী? সভ্যতার ওই মেকিটুকু যত গায়ে জড়াবে তত ঠুনকো হয়ে যাব। কী বলো সালমা?

সালমা হাসে। সাব্বির সালমার দিকে ফিরে হাত নেড়ে বলে, দেখো সালমা, তুমি কিন্তু তোমার বন্ধুকে কখনো এমন করে শাসন করবে না কেমন? মাঝে মাঝে দুজনে একদম পেঁয়ো মূখের মতো আচরণ করবে। মনে করবে তোমরা সভ্যজগতের বাইরে বসবাস করছ। নইলে জীবনে কোনো চার্ম থাকে না সালমা। নাসিমাকে আমি কিছুতেই এ কথাটা। বোঝাতে পারি না।

সালমা কিছু বলার আগেই শুরু হয়ে যায় দুজনের তর্কবিতর্ক। ও তখন নিঃশব্দে কেটে পড়ে। তবু ওরা বেশ আছে। সালমা ভাবল, সাব্বির ভাই এখন বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। অথবা বড় সোফাটার ওপর চিত হয়ে পা দোলাচ্ছে। মুখে দেদার শিস বাজাচ্ছে। খুব আস্তে করে চেঞ্জার বাজছে।

দৃশ্যগুলো কল্পনা করতে সালমার বেশ লাগছিল। মাঝে মাঝে এমনি করে দৃশ্য সাজাতে ভালো লাগে। রঙের পরে রং। ছবির পরে ছবি। চোখ বুজে একের পর এক পৃষ্ঠা উল্টে যাওয়া। ভীষণ দুর্দান্ত ব্যাপার। দুর্দান্ত শব্দটা আসলে সালমার খুব প্রিয়। সামান্য কিছুকেই দুর্দান্ত ভাবতে ভালোবাসে ও। সাকিব মাঝে মাঝে বলে, তোমার শব্দ ব্যবহার ঠিক হচ্ছে না দিদিভাই।

কখনো ওই না-হওয়াতেই তো যত আনন্দ, যত রোমান্স। তুই কী বুঝবি হাঁদা কোথাকার।

শেষেরটুকু আবার বেশি বললি কিন্তু।

সাকিব এসে পেছন থেকে চুল ধরে টান দেয়।

তখন থেকে দেখছি বারান্দার ওপর বসে রয়েছিস?

তোর তাতে কী?

ইউনিভার্সিটি যাবি না?

না।

আমি চললাম।

সাকিব বেরিয়ে যায়। পরনে জিন্সের প্যান্ট। পায়ে কেডস। গায়ে বিদেশি গেঞ্জি। ব্যাডমিন্টনের চঞ্চল কর্কের মতো দেখাচ্ছে ওকে। সালমা হেসে ফেলল। এক একজনকে কেন্দ্র করে বেশ এক একটা উপমা মনে আসছে ওর।

সারা বাড়ি চুপচাপ। কেবল রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁকছুঁক শব্দ আসছে। আনুর মা রাঁধছে। জলিল মিয়া বাগান ছেড়ে এখন ঘরদোর পরিষ্কার করছে। খাটতে পারে লোকটা। কাজের কথা বলতে হয় না। যতক্ষণ সময় পায় ততক্ষণ কিছু না কিছু করতেই থাকে। সালমা হাঁটতে হাঁটতে পেছনের বাগানে আসে। পেছন দিকটা একটু স্যাঁতসেঁতে। রোদ কম। তাছাড়া গাছগাছালির ঘন মাথার জন্য ভিজে ভিজে থাকে। সালমার খুব ভালো লাগে। নাসিমা মাঝে মাঝে বিকেলবেলা এখানে এসে বই পড়ে। এছাড়া আর কেউ আসে না। সালমার মনে হয়, এটা একলা ওর রাজত্ব। বড় কাঠের বাক্সে দুটো ধবধবে সাদা খরগোশ আছে। এ দুটো সালমার খুব প্রিয়। যত্ন করে পালে। নির্জন অবসরে ছেড়ে দেয়। কোলে নিয়ে ঘাস খাওয়ায়। চুপচাপ বসে ওদের ছুটোছুটি দেখে। আর তখনই

মনে হয় এই সেই দ্বীপ। যে দ্বীপে ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে। চারদিকে নীরব প্রকৃতি। আর কেউ ওকে সঙ্গ দেয় না। খরগোশ দুটো আনন্দ আর বেদনার মতো সালমার মনের মাঠে ছুটোছুটি করে। এর বাইরে আর কিছুই নেই। খরগোশ দুটোর নাম রেখেছে সুখ-দুঃখ। সালমার নির্জন পৃথিবীতে সুখ-দুঃখই একমাত্র সঙ্গী। এর বাইরে আর সব মিথ্যে। বাবা, মা, সাকিব, নাসিমা আপা, জলিল মিয়া সব মিথ্যে। ওদের উপস্থিতি সালমাকে তেমন নাড়া দেয় না। ওর না থাকলেও সালমার জীবন চলে। এই গাছগাছালির মতো নীরব অনুভূতি, দূরের আকাশের মতো এক টুকরো হৃদয়, মাটির মতো রক্তের উত্তেজনা, ওই খরগোশের ছুটোছুটির মতো আনন্দ আর বেদনা। এর বাইরে একটা মানুষের জীবনে আর কী থাকতে পারে? আর কিছু থাকারই বা প্রয়োজন কী? আর কী লাগে? আরো কিছু লাগে।

ধক্ করে ওঠে বুক। সেই সঙ্গটুকু লাগে, যা মানুষের অস্তিত্বের বিকাশ ও স্থিতি দীর্ঘ করে। সালমার তখন কিছু ভালো লাগে না।

ওই সঙ্গটুকু জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলতে ইচ্ছে করে। খেলতে ক্লান্তি নেই। রকিব বলে, যতই তুই না বলিস ঘুরেফিরে কিন্তু ওই এক জায়গাতেই এসে দাঁড়াতে হবে তোর। জানিস সালমা, আমার ভাইয়ের ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে মজা করি। ওকে ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে বুকের মধ্যে লুফে নিই। ও বেশ আনন্দ পায়। খিলখিলিয়ে হাসে। আমাকে কিছুতেই থামতে দিতে চায় না। আমি থেমে গেলেই বলবে, কাকু আবাল। এও সেই আবাল খেলা সালমা। ভীষণ মজা।

সালমা চট করে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই কখনো খেলেছিস রকিব?

রকিব মুখটা লাল করে বলেছিল, হ্যাঁ।

হয়তো সালমার সামনে খুব সহজে বলতে চেয়েছিল বলে মুখ লাল হয়েছিল। অথবা সালমাকে মিথ্যে বলতে চায়নি। কিংবা সালমার সামনে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চেয়েছিল। সে যাই হোক, রকিবের উত্তরে সালমার মন খারাপ হয়নি। হাতে-পায়ের গিটে গিটে কেমন একটা অবসাদ জড়িয়ে থাকে। কেমন বিষণ্ণ চোখে রকিবের দিকে

তাকিয়েছিল। বুঝতে চাইছিল, কোথায় রকিবের সুখ আটকে আছে। না, খুঁজে পায়নি সালমা।

তুই কার সঙ্গে খেলেছিলি রকিব?

তুই তাকে চিনবি না।

বল না কে?

বড় ভাবির ছোট বোন।

কোথায় খেলেছিলি?

নৌকায়। একদম মাঝ নদীতে।

কেমন করে পেলি?

ওকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনার জন্য একবার আমাকে পাঠানো হয়েছিল।

তুই সুযোগের ব্যবহার করেছিস?

মানুষে তো সারাজীবন ধরে সুযোগই খোঁজে সালমা।

সালমা আর কথা বলতে পারেনি। অনেক নাড়াচাড়া করেছে। রকিবের কথা নিয়ে। মানুষ সুযোগ খোঁজে। সুযোগ পেলে ঘটনা ঘটায়। আর অন্যজন সেই ঘটনার শিকার হয়। ভালো এবং মন্দ দুই অর্থেই ঘটনার শিকার হয়।

হঠাৎ সালমার খরগোশ দুটো দৌড়ে সালমার কোলের কাছে চলে আসে। ওর শাড়ির নিচ থেকে ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়ায়। সালমা চারদিকে তাকায়। কী কারণে ওরা ভয় পেল? ছোট পেয়ারা গাছটার তলায় একটা বেজি মাথা উঁচিয়ে আছে। ও হাততালি

দিতেই পালিয়ে যায়। খরগোশ দুটো কিছুতেই আর বেরোতে চায় না। নিরাপদ আশ্রয়ে দিব্যি বসে থাকে। সালমার বুকটা কেমন করে। সুখ-দুঃখ এমন করেই বুকের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। ঘটনা এসে বারবার তা বানচাল করে তোলে। কখনো এপাশে দোলায়, কখনো ওপাশে। নির্জন বাগানটার আপন বৃত্তে। সালমার খেলা জমে ওঠে। সমস্ত অনুভূতি আর আবেগ নিয়ে খেলা। কখনো ঘুম পায়। ভীষণ অবসাদে এলিয়ে পড়ে। যখন সজাগ হয় ফালি ফালি করে চিরে দেখে নিজেকে। কোনো সূত্র খুঁজে পায় না। বিষাদ, হতাশা–এমনি আরো কতকগুলো বাজে শব্দতাড়িত ভাবনা কাত করে ফেলে। আঙুর গাছের লতায় টুনটুনি লাফায়। বাংলাদেশের মাটি বলে অসম্ভব টক আঙুর। খাওয়া যায় না। বাড়িওয়ালার খুব শখের গাছ। সেজন্যে সালমাও যত্ন করে গাছটার। দোতলার জানালায় নাসিমার হলুদ পর্দা কাঁপে। ইংরেজি গান ভেসে আসছে। হয়তো এতক্ষণে নাসিমা আপাও এসে গেছে। ওরা এখন কী করছে? সালমা ভাবতে চাইল। ভাবতে পারল না। ভীষণ লজ্জা পেল।

আপামণি? ও আপামণিও সারাবাড়ি আপনাকে খুঁজছি।

কেন?

স্যার ডাকে।

আসছি।

বাবা ফিরেছে। বাবাকে স্যার ডাকে জলিল মিয়া। করতোয়া পাড়ের ছেলে শহরে এসে স্যার ডাকা শিখেছে। বাবা কখন ফিরল? গাড়ির শব্দ তো পায়নি সালমা। কটা বাজে? সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর। গাছগাছালির ছায়া বলে তেমন জোরালো বোদ নয়। মাঘের শেষ। দিনরাত পাতা পড়ে। সালমার নির্জন পৃথিবীতে হলুদ পাতা বিছিয়ে আছে। জলিল মিয়া একবার করে পরিষ্কার করে। পায়ের নিচে মচমচ করে পাতা। এবং সালমা ইচ্ছে করে এক একটা শুকনো পাতার ওপর পা দেয়। মচমচ শব্দ শুনতে বেশ লাগে। মনে হয়, আদিম পৃথিবীর প্রথম ধ্বনি। সমস্ত মাটি কাঁপিয়ে উঠে আসে। অথচ কত মৃদু! সেতারের মতো।

সালমা ওর সুখ-দুঃখকে কাঠের বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। সবসময় ছেড়ে রাখে না। ছেড়ে রাখলে বেজির ভয়, বনবেড়ালের ভয়। আরো কত কী! পাশের বাসার দুষ্ট ছেলেটার ভীষণ লোভ এ দুটোর ওপর। ঘাসের শীতল শরীরের স্পর্শ নেবার জন্য সালমা স্যান্ডেল জোড়া হাতে নেয়। তারপর অকারণে একবার সারা বাগানটা বেড়ায়। মন্দ না। মনে মনে বলে, আমি বৃত্ত তৈরি করছি এবং তাকে প্রদক্ষিণ করছি।

আপামণি?

জলিল মিয়ার বিরক্ত কন্ঠ।

বললাম তো আসছি।

স্যার খাবার টেবিলে বসে আছেন।

সালমা কথা না বলে পা বাড়ায়। অসহ্য! নিজের ইচ্ছেমতো কিছু করার জো নেই। কোথাও না কোথাও বাধা পড়বেই পড়বে। যত্তসব। বাগান পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দা। সামনে লন। লনের একপাশ দিয়ে ঘরে ওঠার সিঁড়ি।

সালমা বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। খাবার ঘরে ঢুকে দেখল বাবা গম্ভীর মুখে বসে আছে। এখনো খাওয়া শুরু করেনি। সালমাকে দেখে প্লেট টেনে নিতে নিতে বলে, কী করছিলে?

কিছু না।

আমার আবার তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে।

তুমি খেয়ে নিলেই পারতে।

তুমি জানো, তোমাকে ছাড়া আমি খাই না। তাছাড়া তুমি যখন বাসায় রয়েছ।

মনে করতে আমি বাসায় নেই।

কী যা তা বলছ!

বাবার কন্ঠস্বরে বিরক্তি। সালমা চুপ করে যায়। ভাবে মনে করা না করার মাঝ দিয়েই তো একজনের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায়। যায় না? ও যদি এখন চোখ বুজে ভাবে যে বাবা নেই তাহলে কেমন হবে? এই করেই তো বাবাকে উপেক্ষা করা যায়। সালমা একটুক্ষণের জন্য চোখ বুজল। দেখল যে, না, হয় না। কিসের যেন শব্দ হতে থাকে। সেই শব্দ অস্তিত্বের জানান দেয়।

তোমার ঘুম পাচ্ছে লিমা?

না তো।

সালমা তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে। বাবার সামনে ধরা পড়ে গেছে। একটু লজ্জাও পায়।

তুমি কিছু খাচ্ছ না?

খাচ্ছি।

দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছ?

তোমরা আমাকে নিয়ে বেশি ভাবো।

ভাবব না, তুমি আমাদের একটা মেয়ে—

আমার ভালো লাগে না।

বাবা একটু থমকে ওর মুখের দিকে তাকায়। সালমা চোখ নিচু করে। পরপর কয়েক গ্রাস ভাত মুখে গুঁজে দেয়।

অমন করে খায় না লিমা।

সালমা কথা বলে না। বাবার কন্ঠ নরম শোনায়। বুকের ভেতরের একটা নির্দিষ্ট স্থান থেকে সে কথাগুলো উঠে আসছে। যে স্থানটা শুধু সালমার জন্য। আর কারো জন্য নয়।

তোমার কী ভালো লাগে বলো তো মা?

আমি চাই তোমরা কেউ আমার জন্য যেন বেশি না ভাবো।

আচ্ছা।

বাবার মুখটা অপরাধী দেখায়।

প্লেটের অবশিষ্ট ভাতগুলো চটপট খেয়ে ফেলে। জলিল মিয়া মিষ্টির বাটি রেখে যায়। খাওয়ার পর, মিষ্টি না খেলে বাবার ভাত হজম। হয় না। অথচ সালমা খুব বেশি মিষ্টি খেতে পারে না। মিষ্টি খেলে নসিয়ার মতো লাগে।

তুমি না বলছিলে, তোমার কোথায় যাবার তাড়া আছে।

হ্যাঁ, একটা মিটিং আছে।

বক্তৃতা করবে?

সালমার চোখে সকৌতুক হাসি।

দেখো না, ওরা আমাকে সভাপতি করে ছাড়ল। আমার একদম ইচ্ছে ছিল না। আমি না করেছিলাম, তা ওরা শুনলই না। বাধ্য হয়ে এখন যেতে হবে।

বাবা এমন একটা ভাব করল যেন ভীষণ অনিচ্ছায় যাচ্ছে। এসবের প্রতি তার কোনো মোহ নেই। সালমা ঠোঁট বাঁকায়। কিছু বলে না। সভা সমিতি বক্তৃতা ইত্যাদির প্রতি বাবা ভয়ানক দুর্বল। কেউ না ডাকলেও জোর করে যেতে চায়। কোনো সভা থেকে বাদ পড়লে রেগে যায়। বলার সময়ে বাবা কি না বলে জোর করে ধরল। বাজে কথা। এটুকু শুধু বলার জন্য বলা। সালমা তো চেনে ওর বাবাকে। বাবার বক্তৃতার কোনো অর্থ ও খুঁজে পায় না। নিজের জীবনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই সেইসব বড় বড় কথা বাবা চমৎকার সাজিয়ে বলে। মানুষ এমন অবলীলায় কেমন করে মিথ্যে কথা বলে এটাই বুঝতে পারে না সালমা। বাবাকে না দেখলে ও হয়তো বিশ্বাসও করতে পারত না মানুষের। মুখোশপরা চেহারার আদল ভিন্ন। নিজে যা বিশ্বাস করে না অপরকে তা বোঝাতে চেষ্টা করে। শুধু হাততালি পাওয়ার জন্য সব ধরনের বুলি এরা কপচাতে পারে। একটুও ভেবে দেখে না কতটুকু বলা ঠিক হলো। সালমা প্রথম প্রথম বাবার সঙ্গে যেত। এখন যায় না। বাবাও নিতে চায় না। কেননা বাসায় এসেই সালমা বাবার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। নাজেহাল করে। বাবা বিরক্ত হয়। সালমার চিন্তার খেই ছিড়ে বাবা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ায়। বাবা বারান্দার বেসিনে হাত ধুচ্ছে। সেই সময়টুকু অপেক্ষা করে সালমা। বাবা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে টুক করে উঠে পড়ে।

আনুর মা অভিযোগ করে।

আপনি কিছু খাননি আপামণি।

ধুৎ, সবার মুখে কেবল এক কথা! বেশি খাও আর বেশি খাও। সালমা গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়। নিজের ঘরে চলে আসে। ঘুমোতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু ঘুম কি আসবে? ঘুমটাকে কিছুতেই। বাগে আনতে পারে না ও। সাজু বলে ঘুমের ওপর ওর নাকি আশ্চর্য দখল। ইচ্ছে করলে দুমিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে যেতে পারে। ঘুমুবার আগে পাঁচটার সময় উঠব মনে করে, যদি ঘুমোয় ঠিক পাঁচটায় ঘুম ভেঙে যায়। ফানি! কেমন করে সম্ভব? আর সালমা ঘুমুতে চাইলেই ঘুম পালায়। পঁচিশ মিনিট এপাশ-ওপাশ

করার পর তারপর যদি ঘুম আসে। বিছানার ওপর শুয়ে শুয়ে পা দোলায় ও। দাঁতের নিচে এলাচের দানা। ঝাল ঝাল। মিষ্টি স্বাদ।

লিমা? ও লিমা?

আসছি।

বাবার এই এক অভ্যেস। কারণে-অকারণে সালমাকে শুধু ডাকবে। সালমা যত দূরে যেতে চায় বাবা তত কাছে টানতে চায়। মাঝে মাঝে রাগ হয়। ইচ্ছে করে জবাব দেয় না। কিন্তু এ করেও কি উপায় আছে! বাবা জোরজবরদস্তি করে কেবল। সালমা যেন একটা ঘোড়া। বাবা তাতে লাগাম জুড়ে রেখেছে। টানলেই দৌড়াতে হবে। বোগাস, সম্পর্কের অধিকার-টধিকার সব বোগাস। সম্পর্ক একটা আছে বলেই তো এত জোর খাটানো।

লি-মা-

কী বলছ?

দেখো তো মা, আমার ডায়রিটা কোথায়।

এই তো টেবিলের ওপর।

ওহ হো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। দিন দিন কেমন ভুলো মন হয়ে যাচ্ছে আমার।

সালমা মনে মনে হাসল। ভুলো না ছাই। আসল জিনিস তোমার ঠিকই মনে থাকে। নিজের স্বার্থের ব্যাপারে তুমি কখনো ভুল করো কি। না বুকে হাত দিয়ে বলো তো দেখি? জানি উত্তর পাব না। ওই একটি ব্যাপারে তুমি খুব পারদর্শী। ভীষণ নিখুঁত। তুমি ঠিক জানো কোন। চালটা দিলে রাজাকে কায়দা মতো চেক দিতে পারবে। আমি তোমাকে এ পর্যন্ত ভুল করতে দেখিনি বাবা। আর তুমি কি না বলো সব তোমার ভুল

হয়ে যায়। হাসতে গিয়ে সালমা আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বাবা টাইয়ের নট ঠিক করছে। সালমা টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবাকে দেখে।

জলিলকে একটা রিকশা ডাকতে বলো মা?

তোমার গাড়ি?

ওয়ার্কশপে দিয়েছি।

ও।

সালমা বেরিয়ে যায়। জলিলকে রিকশা ডাকতে বলে সিঁড়ির ওপর। দাঁড়িয়ে থাকে। কড়া দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ চারদিকে। দূরের কোনো গাছ থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে। এখন বাবা বেরিয়ে যাবে। বাড়িটা আবার শব্দহীন হবে। সালমা ডুবে যাবে অন্তরের চোরাবালিতে। ডান পাশের দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সাব্বির ভাই নামছে। শার্টটা কুঁচকে গেছে। মাথার চুল এলোমেলো। সালমার দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ ঘোরাল।

কোথায় যাচ্ছেন সাব্বির ভাই?

রাস্তার মোড়ে। সিগারেট আনব।

একই সঙ্গে বাবাও বেরিয়ে গেল। কাঠের গেটটা খোলা। বাবা বন্ধ করেনি। সালমা উঠে বন্ধ করে এলো। বাতাসে হলুদ পাতা উড়ে যাচ্ছে। খয়েরি পাখি কলাবতীর ঝোপে ডানা মেলে গুটিয়ে নেয়। নিজস্ব ইচ্ছের খেলা। সালমার এখন নিজের সঙ্গে খেলতে ইচ্ছে করছে, এলোমেলো খেলা। ছছাটবেলার মতো। হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ির ধারে এলো। সাব্বির ভাই নেই। নাসিমা আপার ঘরে উঁকি দিয়ে আসি। কী করছে নাসিমা আপা? নিশ্চয় বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে। কত যে পড়তে পারে। পড়তে একটুও ক্লান্তি লাগে। না নাসিমা আপার।

সালমা পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। সামনের দরজা মুখে মুখে লাগানো। আস্তে করে ঠেলে ভেতরে ঢুকল সালমা। না, ড্রইংরুমে কেউ নেই। ফ্রিজের মুখ খোলা। মেঝেয় সিগারেটের টুকরো ছড়ানো। অ্যাশট্রে ভর্তি। টেবিল-ক্লথ সোফার ওপর। ফুলদানি উল্টে আছে। সালমা নাক কুঁচকাল। পরিপাটি সাজানো ঘরটা কেমন বিশ্রী করেছে ওরা। নিশ্চয় সাব্বির ভাইয়ের কাজ। সালমা ঘুরেফিরে হতাশ। ভাবল, চলে যাবে। অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। এভাবে অন্যের ঘরে ঢোকা ঠিক নয়। আবার কৌতূহল হলো। নাসিমা'পা কী করছে? সাড়াশব্দ নেই কেন?

সালমা পর্দা সরিয়ে বেডরুমে উঁকি দিল। শিরশিরিয়ে উঠল অনুভূতি। সালমা দেখল। একবার। দুবার। তিনবার। চোখ বুজে শুয়ে আছে নাসিমা। না, ঘুমোয়নি। শুয়ে শুয়ে হাতের আঙুল নাচাচ্ছে এবং নাসিমা'পা নগ্ন। সালমা যেমনি এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। উত্তেজনায় হাত-পা কাঁপছে। আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কেমন যেন লাগছে সালমার। ঝিমঝিম করছে মাথা। বারান্দায় বাবার ইজিচেয়ারটার ওপর বসে পড়ে। একটু পরে সাব্বির সিঁড়ি দিয়ে উঠে। গেল। মুখের দিকে তাকায় না সালমা। আড়চোখে দেখল, হাতে ডানহিলের প্যাকেট। লাল রঙের সেই প্যাকেটটা অবিকল রকিবের মুখ হয়ে গেল। সালমার রক্তের লোহিত কণিকায় রকিবের নিঃশ্বাস বয়ে। যায়। ঘুম পায় ওর। কেমন সহজে ঘুম আসে। আশ্চর্য, সালমা ঘুম চাচ্ছে না, তবু ঘুম আসছে। স্বচ্ছন্দে ও তরতরিয়ে সালমার চোখের কূলে এসে ভিড়ছে ঘুমের তরী। সালমা বিড়বিড় করল, রকিব তুই কতবার আবাল খেলা খেলেছিস–রকিব তুই কি সুখ পেয়েছিস–নাসিমা'পার বোজা চোখে-নগ্ন বুকে নৃত্যরত আঙুলের ডগায় আমি নীল সুখ দেখেছি–রকিব তুই জানিস না আমার কেমন যেন লাগছে।

রকিব তুই কতজনের সঙ্গে আবাল খেলা খেলেছিস? কতজন–রকিব কতজন–কতবার–রকিব কতবার ক-ত-বা-র। কতরাত কতদিন তোর খুব কষ্টে কেটেছে রকিব। তুই অনেকবার সে গল্প করেছিস। জানিস আমার ইচ্ছে তুই আর আমি একদিন চলে যাব আমার সেই নির্জন দ্বীপে। শুধু তুই আর আমি। আর কেউ না রকিব। আর কেউ না। এমনকি আমাদের ইচ্ছেগুলোও আমাদের সঙ্গে নেব না। পোশাকের মতো সমস্ত ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ নগ্ন হতে পারে না। বল না রকিব, পারে কি না? নাসিমা'পার মতো শুধু পোশাক খুলে নয়, আমি তেমন ন্যাংটো হতে চাই, যা

আমাকে একদম বদলে দেবে। একদম অন্য মানুষ হতে পারলে জীবনটাকে বেশ উপভোগ করা যায়, কি বলিস? ধর, তুই সালমা হলি আমি রকিব? তাহলে কেমন হবে? মনে হবে না আমরা নতুন সৌরমণ্ডল গড়তে পেরেছি? নাসিমা'পা বড় অল্পে সুখ পেয়েছে। আমার তা ভালো লাগেনি। ওটাকে সুখ বলে না। এটা হলো ইচ্ছের দাসীগিরি করা। ধুৎ, বাজে! ওই নীল সুখ আমি চাই না। আমি আরো গভীরে যেতে চাই রকিব। আরো গভীরে। সে তলায় গিয়ে যেন আর ঠাঁই না পাই।

রকিব, তুই আমাকে নিয়ে যাবি সেই দ্বীপে? আমি যাব। স্লোমোশন ছবির মতো যাব। নিঃশব্দে। ভেসে ভেসে। আঃ, কী আনন্দ! সুখ পেতে হলে সুখের মতো করে পেতে হবে। একটু সুখে তৃপ্তি নেই। স্থূল হয়ে যায়। তুই আর আমি আলাদা জগৎ গড়ব। নিয়ম ভাঙব। সুখের রং দেব। পাখির ডাক বদলাব। গাছের পাতা বানাব। আমরা বিধাতার মতো হব। সৃষ্টির আনন্দে মাতব। আরো কত কী রকিব! কত কী!

সালমা চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করে। পারে না। ওপরে নিচে কে যেন আঠা লেপে দিয়েছে। সালমা বুঝতে পারছে পারিপার্শ্বিক নির্জন হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশে কাত হয়ে পড়া সূর্যের একফালি রোদ। সালমার পায়ের ওপর এসে পড়েছে কিসের মিনতি জানায়? সালমা। আস্তে আস্তে ঘুমের প্রশান্ত সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। সালমার গোলাপি ঠোঁটে নীল সুখ কাপে। এবং মনে হয় নিজের মধ্যে কোথাও কোনো ভার নেই। সালমা একদম ন্যাংটো হয়ে গেছে। সে বোধের সঙ্গে সঙ্গে ওপরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও আর কোনো সাড়া নেই। সালমার নির্জন পৃথিবীতে ও একা।

বাগানে রোদের লুটোপটি। কলাবতী ঝোপ থেকে টুনটুনি উড়ে গেছে। হলুদ প্রজাপতিও নেই। আনুর মা রান্নাঘরের বারান্দায় আঁচল পেতে শুয়ে আছে। জলিল মিয়া কামিনী গাছের নিচে বসে বিড়ি টানে। দুপুরে ঘুম আসে না ওর। করতোয়া পাড়ের ছেলে সহজে অলস হয় না। কাঠের বাক্সের ভেতরে সালমার সুখ-দুঃখ একে অপরের গাঁয়ে মুখ ঘষে। জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে। বাটি থেকে দুধ খায়। অথবা তারের ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আম, নিম, আমড়ার পাতা ফস করে জ্বলে ওঠা দিয়াশলাইর কাঠির মতো টুপ করে ঝরে যায়। বেদনাহীন ঝরায় কোনো আলোড়ন নেই।

ওপরের ঘরে সাব্বির আবার দরজা লাগিয়েছে। ড্রয়িংরুমে আরো সিগারেটের টুকরো জমেছে। জানালার হলুদ পর্দার শরীরে বাতাসের কাঁপন। নাসিমার নগ্ন বুকে নীল সুখ থির থির করে। সুখ আস্তে আস্তে গাঢ় হয়। গাঢ় থেকে প্রগাঢ়। সাব্বিরের হাতের সিগারেট নিঃশেষ।

সালমা অনবরত তলিয়ে যাচ্ছে। শব্দময় জগৎ থেকে নির্বাসিত ও। সালমার পৃথিবী এখন ঈভের স্বর্গোদ্যানের মতো আশ্চর্য ঐশ্বর্যময়।

বাবা জাহিদ চৌধুরী মনে করে

বাবা জাহিদ চৌধুরী মনে করে, সালমা উর্বর জমির মতো। ভালো করে না চষলেও আশ্চর্য ফসল ফলে। মা মনে করে, সালমা মোহনার মতো প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার পলিমাটিতে ভর্তি হয়ে যায়। নইলে সারাক্ষণ এমন আজগুবি উদ্ভট চিন্তা ওকে পাগল করে রাখে কেন? নিয়মের ব্যতিক্রমটা ও বেশি ভালোবাসে। ওতেই আনন্দ পায়।

বাবা এবং মেয়ে। মা এবং মেয়ে। ভাই এবং বোন। সম্পর্কের এ নির্ধারিত বেড়াজাল সালমার ভালো লাগে না। সম্পর্কের সূত্র ধরেই মানুষ মানুষের ওপর অধিকার খাটায়। প্রভুত্ব করার সাধ হয়। বাবা-মা ওকে কত ভালোবাসে। অন্য আরো দশজন বাবা-মার চাইতেও বেশি। আর বেশিটাই সালমার মনে হয় বাড়াবাড়ি। মনে হয়, তারা তাদের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছে।

সালমার মনে হয়, মানুষ যখন এত কিছু স্বীকার করে একটি অন্ধ অবস্থানের মধ্যে বসবাস করে তখন সেটা তার জন্য এক চরম লজ্জাকর। অসুস্থতা। নইলে সম্পর্কের এ বেড়ি কেউ ভাঙে না কেন? কেন নিজের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে না? বাবা-মা

তাদের সম্পর্কের গণ্ডিতে নিশ্চিত। সাকিবেরও একই অবস্থা। নির্ভাবনাময় জগতে ঘুমিয়ে আছে যেন। পরিবেশ এবং অবস্থানকে প্রশ্ন না করার অর্থ আপন সত্তাকে উপেক্ষা করা। সালমার বুকটা আবার ধড়ফড় করে। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তার বুনট ঘন হয়ে জমতে থাকে। আসলে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অভিরুচি দিয়ে আপন স্বভাব গড়ে তোলা দরকার। উত্তরাধিকারসূত্রে সমাজের কাছ থেকে পাওয়া সংস্কারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে এমন শর্ত তো কেউ দেয়নি। তবে এত সহজে সবকিছু গ্রহণ করে নির্বিবাদ হয়ে যাওয়ার কী মানে থাকতে পারে। সংসার সমাজ পৃথিবী মানুষের হাতে কিছু পৌঁছে দেয় না। সকালবেলা উঠে কেউ দেখে না দরজায় তার জন্য সোনার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে–সব পেয়েছির দেশে তাকে নিয়ে যাবে। আসলে আপন পরিকল্পনা এবং কাজ দিয়ে সবাইকে ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়। সারা জীবনের পরিশ্রমে সে জমিতে ফসল ফলে। মানুষের এই একক সত্তায় যখন অন্যের প্রতিফলন নেই, তখন সম্পর্কের বাঁধন এত শক্ত করার দরকার কী?

আমি চাই নিজের কাছ থেকেও মুক্ত থাকব। সালমা ভাবল। আমি চাই প্রতি মহর্তে নিজেকে অতিক্রম করে চলতে। আমার এই মানবীর চাই প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অতিক্রম করে চ চৈতন্যের জগৎই আসল। এছাড়া আর কোনো জগৎ নেই। সালমার নসিয়া তীব্র হয়ে ওঠে। কৌটা খুলে এলাচদানা মুখে দেয়। ফুল স্পিডে ফ্যান ছাড়ে। ভীষণ গরম লাগছে। দরজা বন্ধ করে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে। সারা গায়ে গরম স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। হাঁসফাঁস করে সালমা। কী যন্ত্রণা! বাইরে কাকটা বিশ্রী শব্দে ডাকছে। ওটার গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে। এমন কর্কশ কন্ঠ? সুখ-দুঃখের কথা মনে হয় সালমার। ওরা কী করছে? ওরাও কি সালমার মতো গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে? ধুৎ, বাজে ভাবনা! সালমা ঠাণ্ডা মেঝের ওপর বালিশটা বুকে চেপে শুয়ে থাকে। বাবার কথা মনে হয়।

বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। দর্শনের অধ্যাপক। সালমাও ওই একই বিষয়ে পড়ে। বাবা যা পড়ায় সালমা তা বোঝে না। বাবার লেকচার মনে হয় ষাঁড়ের চিৎকারের মতো। সালমার একদম ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয় আসলে বাবা কিছু জানে না। জানে না বলেই গর্জনটা বেশি। সালমা ভেবে পায় না যে বাইরের লোকেরা বাবাকে পণ্ডিত বলে কেন? তিনটে-চারটে ডিগ্রি আছে বলে। শুধু ডিগ্রি থাকলেই একজন লোক শিক্ষকতার অধিকার অর্জন করে। সালমা হিসাব করে দেখল যে বাবার নিজের জীবন অসংখ্য গলদ এবং ত্রুটিতে ভরা। তার কথা এবং কাজে কোনো সামঞ্জস্য নেই। বাবা

খ্যাতির মোহে পাগল। টাকার মোহে পাগল। এর বাইরে বাবা ভালো কিছু চিন্তা করতে পারে না। একটি লোক এত ত্রুটি নিয়ে অন্যকে কী শেখাবে? শিক্ষকতা করার তার কোনো অধিকার নেই। নিজের সঙ্গে আপস করে যে নিজের চরিত্রকে নোংরা করেছে তার কাছ থেকে অন্যে কী শিখবে? বাবার কী অধিকার আছে শিক্ষকতা করার? জীবিকা নির্বাহের জন্য তিনি অন্য কিছু করতে পারেন। শিক্ষকতা নয়। সালমার বুকটা ধক করে ওঠে। আসলে বাবা চরিত্রহীন। এই শব্দটা বাবার চরিত্রের মেজাজের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এসব কথা ভাবতে গেলে ঠাণ্ডা মেঝেয় শরীর শীতল হয়ে আসে।

অথচ বাবা-মা নাসিমাকে দিন-রাত চরিত্রহীন বলে গাল দেয়। স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর নাসিমা বিয়ে ছাড়াই আরেকজনের সঙ্গে বসবাস করে। এটা তার অপরাধ। অনেকের মতে নাসিমা অ্যাবনরমাল। একদিন সালমা এ প্রসঙ্গ উঠিয়েছিল।

নাসিমা'পা, কেউ কেউ বলে তুমি নাকি অ্যাবনরমাল?

রেগে গিয়েছিল নাসিমা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছিল, যে প্রতি পদে পদে নিজের সঙ্গে আপস করে তোরা তাকে বলিস নর্মাল। সেই তো সবচেয়ে বড় অ্যাবনরমাল। কেননা সে নিজের মতো করে বাঁচতে জানে না। তার নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই। আমি নিজের মতো করে বাঁচতে জানি বলেই আমি অ্যাবনরমাল, তাই আমাকে নিয়ে এ সমাজের মাথাব্যথা।

নাসিমার কথাগুলো নিয়ে সালমা অনেক ভেবেছে। ভেবে কুলোতে পারেনি। তার বাব-মার অযাচিত মন্তব্যও সালমার ভালো লাগে না। কারো সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে নিজের চরিত্রটা অন্তত একবার যাচাই করে দেখা উচিত। মানসিকতার কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কথা বলবে সেটা যদি মাপা না থাকে তবে ব্যক্তি হিসেবে তার কিসের মহত্ব? বাবা নিজেকে অতিক্রম করতে পারেনি। আপন সীমিত গণ্ডির মধ্যে ঘুরে মরে। যত অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তিই হোক নিজেকে যে অতিক্রম করতে পারে না তার কোনো মহত্ব থাকে না। সালমা হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবতে ভাবতে সব গুলিয়ে যায়।

দিন-রাতের ভাবনা নিয়ে ক্লাসে যায়, লেকচার শোনার চেষ্টা করে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কোনোরকমে ক্লাসে কাটিয়ে বেরিয়ে আসে। করিডরে গিজগিজ করে ছেলেমেয়ে। রকিবের সঙ্গে বেরিয়ে আসে ও। তখন হয়তো পরের পিরিয়ডের ক্লাস শুরু হয়ে যায়। রকিব প্রথম দিকে অবাক হতো। এখন হয় না। জানে সালমা এখন ক্লাস করবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে রকিবেরও ক্লাস করা হয় না। দুজনে ফুটপাত ধরে হাঁটে, চারুকলা কলেজের সামনে দিয়ে রেসকোর্সে ঢোকে। নিরিবিলি জায়গা দেখে বসে। কারণে-অকারণে সালমা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

দেখ সালমা অমন করে হাসিস না। তোর হাসি দেখলে রাগ হয়।

নতুন কথা শোনালি। ছেলেরা নাকি মেয়েদের হাসি শুনলে খুশি হয়?

সে তোর মতো মেয়ে না।

তাহলে কার মতো?

ওই যে ঝরনা, মহুয়া ওদের মতো। ওরা মিটমিটিয়ে হাসে, লঘুছন্দে চলে, চকিতে চায়। দেখিস না আমার বন্ধুরা ওদের নিয়ে কবিতা লেখে।

উফ ওদের ভাবভঙ্গি দেখলে আমার কী মনে হয় জানিস?

কী?

মনে হয় বিড়াল মাছ চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে।

হেসে ওঠে রকিব। সালমা এমনি স্বচ্ছ। অনাবিল স্রোতের মতো। বাতাস কেটে সোজাসুজি চলে। আড়চোখে আশপাশে চায় না। মুখে এক, মনে আর এক নয়। আর এজন্যেই সালমার সঙ্গে রকিবের সখিভাব।

জানিস রকিব, মা মাঝে মাঝে বলে আমি নাকি উচ্ছন্নে যাব। তুই বল নিজের মতো করে কিছু করাকে কি উচ্ছন্নে যাওয়া বলে?

কী জানি। জানি না।

জানিস রকিব, ওই মহুয়াদের মতো চিরকালের মেয়ে হতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে অন্যরকম হতে।

তুই তো অন্যরকমই।

কই আর!

সালমা চুপ করে যায়।

রকিবের মনে হয়, সালমার ভেতরে একটা টেপ রেকর্ডার আছে। ও অনবরত ওখানে শব্দ ধরে রাখে আর বাজায়। ওর মনের মধ্যে বিভিন্ন ভাবনা কাজ করে। বাবার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগ পুষে রাখে বুকের মাঝে। বুড়োদের দুচোখে দেখতে পারেনা। বুড়ো বয়সটাকে ভয় পায়। মাঝে মাঝে বলে, জানিস আশি-নব্বই বছরের কথা চিন্তা করলে আমি শিউরে উঠি।

আমার বেশ ভালো লাগে।

যাঃ!

সত্যি বলছি। আমার মনে হয় তখনই তোর সঙ্গে আমার ভালোবাসা গাঢ় হবে।

মিথ্যে কথা! আচ্ছা রকিব, তখন তুই আমাকে চুমু খাবি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়। একশোবার। আরো বেশি করে খাব।

হরিবল!

সালমা ঠোঁট বাঁকায়। দুহাতে মুখ ঢাকে।

ওই বয়সের আগেই আমাকে মরতে হবে।

সালমা কেমন বিষণ্ণ সুরে বলে। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। রকিবও আর কথা বাড়ায় না। মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে থেকেও কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় সালমা। তখন রকিবের খারাপ লাগে। অন্য সময় ও খুব সপ্রতিভ। ক্লাসের কাউকে পরোয়া করে না। কাছাকাছি বন্ধুদের তুই ছাড়া কথা বলে না। হাসিতে ঠাট্টায় মাতিয়ে রাখে। কেউ কেউ অপছন্দ করলেও বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে ওকে পছন্দ করে। সালমার বেপরোয়া চলা, অকারণ উচ্ছ্বাস, দমকা হাওয়ার মতো আচরণ ইত্যাকার গুণাবলি ওকে বেশ জনপ্রিয় করেছে। বন্ধুরা বলে, সালমা যখন যেমন খুশি তখন তেমন। যখন তখন হুঁস করে ইঞ্জিনের গা ছেড়ে বেরিয়ে আসা ধোয়ার মতো নিমেষে ভেসে যায়। সেখানে থৈ পাওয়া দুঃসাধ্য।

সেই গরমের দুপুরে বাবার বিরুদ্ধে ভাবতে ভাবতে চিন্তায় বাবাকেই আঁকড়ে ধরে সালমা। বুদ্ধি হবার পর থেকেই দেখে আসছে সালমার প্রতি তার কী টান! সাকিবের জন্য বাবা এমন করে না। অথচ সালমা ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না। সালমা হবার পর বাবার নাকি চাকরিতে উন্নতি হয়েছিল। প্রচণ্ডভাবে ভাগ্যে বিশ্বাসী বাবাকে গণক বলেছিল, এ মেয়ে আপনার জন্য ভাগ্য বয়ে নিয়ে এসেছে। ও যেদিন ঘর ছাড়বে তারপরই আপনার একটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে।

বাবা কি ভাবে, সালমার ভাগ্যটা বাবার সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা, এজন্যেই ওকে বাবার প্রয়োজন? বুকটা কেমন করে। না ভাবলেই ভালো। সুখের স্মৃতি কিছু ভাবতে চাইল ও। সেই পনেরো বছর বয়সে যখন একবার পোলিও হয়েছিল তখন বাবা একমুহূর্ত ওকে ছেড়ে কোথাও যেত না। কোলে করে এঘর-ওঘর করত। মাঝে মাঝে সালমা ব্যথায় কাঁদত। মনে হতো সালমার যন্ত্রণাটা বুঝি তার নিজের শরীরেই ছেয়ে গেছে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অবশ হয়ে গিয়েছিল। সালমার কন্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসকরত।

কথা বেরোতে চাইত না। কোনোদিকে নড়াচড়া করতে পারত না সালমা। বাবা উৎসুক চোখে ওর। দিকে চেয়ে থাকত। রাতে কাছে নিয়ে ঘুমোত। সালমা কোনোকিছুই ভাবতে পারত না। ভাবতে গেলে মৃত্যুর কথা মনে হতো। আর তখনই কান্না পেত।

তিনদিন বাড়িতে থাকার পর ডাক্তারের পরামর্শে বাবা ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাসপাতাল। দোতলা ঘরে কোণের দিকে ছিল ওর বিছানা। জানালা দিয়ে নিচের জারুল ফুলের গাছ দেখা যেত। সাদা আর বেগুনি থাকা ফুলে ছেয়ে থাকত গাছটা। সালমার ভীষণ ভালো লাগত। ওই গাছ আর মিনু বউদি এখনো হাসপাতালের স্মৃতি হয়ে আছে। বউদি ওকে খুব আদর করত। একজন নার্সের কাছে রোগী হিসেবে যেটুকু সেবা প্রাপ্য ছিল তার বেশি পেত মিনু বউদির কাছে। যেজন্যে হাসপাতাল ওর খারাপ লাগেনি। ওষুধের গন্ধ, ইনজেকশন, স্যালাইন, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি বাজে ব্যাপারগুলো মিনু বউদি ওকে একদম সহজ করে দিয়েছিল। সে কারণে ওষুধ খেতে সালমা কখনো আপত্তি করেনি। সে যত তেতো ওষুধই হোক।

সেটা ছিল জুলাই মাস। যখন তখন ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি আসত। জারুল ফুল গাছটাকে মনে হতো যেন গা পেতে দিয়ে নরম সোহাগ নিচ্ছে। একটা-দুটো পাপড়ি ঝরে যেত। সালমা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকত। বাগানজুড়ে কত ফুলগাছ ছিল। কোনো গাছ এমন করে ওকে টানেনি।

মিনু বউদি ঠাট্টা করত, তুই কি কবি হবি নাকি লিমা? দিনরাত অমন হাঁ করে দেখিস কী বল তো?

কী আবার? গাছ দেখি।

সালমা বেশি কথা বলতে পারত না।

উঁহু, লক্ষণ ভালো না। বাবা এলে বলব, এবার লিমার জন্য একটা টুকটুকে বর দেখতে।

ভালো হবে না বউদি। মিনু বউদি জোরে জোরে হাসত।

তোমার হাতে আমি কিন্তু আর একটুও ওষুধ খাব না। সত্যি বলছি, খাব না। তিন সত্যি করব?

না লক্ষ্মী, না।

বউদি তখন হাসি থামাত। অসুখের জন্য সালমার চুলগুলো বব করে দেওয়া হয়েছিল। সালমা ফোলা ফোলা ফাপা চুল নিয়ে বালিশে মুখ গুজে শুয়ে থাকত।

সালমার বেডের চার-পাঁচ বেড পরে থাকত একটি ছোট ছেলে। মা ছিল ওর সঙ্গে। ওরা ছিল সাঁওতাল। কালো-কুচকুচে গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল পেটানো শরীর। ওই মাকে দেখতে বেশ লাগত সালমার। সারাদিন তিন বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে থাকত। একটুও ক্লান্ত হতো না। ছেলেটার নেফ্রাইটিস হয়েছিল। হাত-পা চোখ-মুখ সব ফুলো ফুলো। জাপানিদের মতো লাগত। ওই ছেলের আগে আরো সাতটা ছেলেমেয়ে মারা গেছে ওদের। চার বছরের ওপরে কোনোটা বাঁচেনি। সাঁওতাল-মা যখন পাশের রোগীর সঙ্গে গল্প করত সালমা শুনত। মনে মনে বলত, তুমি কেঁদো না সাঁওতাল-মা, তোমার ছেলে ঠিক ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু সালমার এমন প্রার্থনা সত্ত্বেও ভালো হয়নি সাঁওতাল ছেলে। দশ দিনের মাথায় ও মরে যায়।

দেয়ালে মেঝেতে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছিল সাঁওতাল-মা। সালমা কেঁদেছিল। ইচ্ছে করছিল সাঁওতাল মাকে জড়িয়ে ধরতে। সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু নিজেই তো নড়তে পারে না। কেমন করে যাবে! সালমা তখন হাতে-পায়ে একটু একটু করে শক্তি ফিরে পাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হাত-পা নাড়তে পারে কেবল। তারপর থেকে কিছুতেই ঘুম আসত না সালমার। আচমকা ঘুম ভেঙে যেত। মনে হতো দেয়ালে কে যেন মাথা ঠুকছে। ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। সালমা চোখ মেলে তাকাতে পারত না। ভয়ে বালিশে মুখ গুজে থাকত। সে মৃত্যুর কথা আজো ভোলেনি ও। স্পষ্ট সব ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কালো কুচকুচে পেটানো শরীরের একজন সাঁওতাল-মা নিজের শরীরকে তুচ্ছ

করে বাচ্চার জন্য কাঁদছিল। সে কী কান্না! কেউ থামাতে পারেনি। এখনো মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে সালমা শুনতে পায় সে ঠকঠক শব্দ।

হাসপাতালের দিনগুলোতে বাবা রোজ যেত। ওকে হাত ধরে হাঁটাবার চেষ্টা করত। ডাক্তার বলেছিল, হাত-পা অনবরত নাড়াচাড়া করতে। সালমা পারত না। দাঁড় করিয়ে দিলে ধুপ করে পড়ে যেত। বাবা কোলে করে উঠিয়ে দিত। আবার দাঁড় করাত।

পাটা সোজা করে ফেল মা। এই তো হয়েছে। বাঃ, লক্ষ্মী মেয়ে। কে বলেছে লিমা পারবে না। আর এক মাসের মধ্যে লিমা পুরোপুরি হাঁটতে পারবে।

বাবা ওকে অনেক সাহস দিলেও ভালোভাবে হাঁটতে এক বছর সময় লেগেছিল সালমার। বার্ম অংশটা অনেকদিন কমজোরি ছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো ওকে। সেইসব দিনে সালমার মনে হতো নতুন করে জীবন ফিরে পাচ্ছে ও। ও এক বছর বয়সে যেমন করে হাঁটত তেমনি হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটা শিখছে। হাঁটতে গিয়ে যখন ধপাধপ পড়ে যেত, সেই সাঁওতাল-মার কথা মনে হতো সালমার। মনে মনে বলত, তুমি কেঁদো না সাঁওতাল-মা, আমি নতুন জন্ম নিয়ে তোমার কোলেই ফিরে এসেছি। তুমি কেবল আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। সাঁওতাল-মা তুমি কেঁদো না। অমন করে মাথা খুঁড়ো না।

বাবা অবাক হতো।

কার সঙ্গে কথা বলছে লিমা?

কই? কী যে বলো!

সালমা লজ্জায় চুপ করে যেত।

মাঝে মাঝে বাবা গাড়ি করে ওকে দূরে নিয়ে যেত। হাত ধরে হাঁটত। সাকিব দুষ্টুমি করত। কখনো রাস্তা ধরে সোজা দৌড় দিত, গাছে উঠত। মাঠে নেমে আখ ভাঙত। বাবা ওর দিকে তাকিয়ে হাসত।

কদিন পর তুমি ঠিক অমনি হয়ে যাবে লিমা।

সালমা কথা বলত না। বাবার সান্ত্বনা ওকে তেমন স্পর্শ করত না। মনে হতো, এ জীবনও মন্দ নয়। সব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও একদম নতুন হয়ে উঠছে। এমন অভিজ্ঞতা ক'জনের হয়। বাবা ভাবে, সালমা বুঝি মনমরা হয়ে গেছে। বোকা, বাবাটা একদম বোকা। হাসপাতালের দিনগুলো ওর কত যে ভালো লেগেছে ও কি কাউকে তা বোঝাতে পারবে? এই যে নিরিবিলি রাস্তায় চুপচাপ হাঁটা, এই বা মন্দ কী? মাথার ওপর বড় বড় গাছের ছায়া। আম, জারুল, জাম, শিরীষ আরো কত কী গাছ। দু-একটা গাড়ি চলে যায় শব্দ করে। তারপর সব নীরব। বাবা কথা বলে না। সালমা হাঁটতে না পারলে গাছতলায় বসে। বাবা বোতল খুলে পানি দেয়। এক ঢোক পানি, গাছের ছায়া, দূরের মাঠ, ইলেকট্রিক তারে ঝক ঝক শালিক–সব সালমার অন্যরকম লাগে। বাবা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করত।

তোমার এখন কেমন লাগছে লিমা?

ভালো।

কী ভাবছ?

একজন সাঁওতাল-মার কথা।

কেন?

জানি না। কেবলই মনে পড়ে। ওর সব বাচ্চা মরে যায় কেন? আল্লাহর এমন ইচ্ছে হয় কেন?

ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই।

আমি মরে গেলে কেমন হতো?

দেখো দেখো লিমা, কী সুন্দর পাখি।

বাবা আমি মরে গেলে কেমন হতো?

দেখো লিমা, পাখিটার সারা গা নীল। এ রংটাকে বলে ব্রাইট বু। তুমি না ওইদিন জিজ্ঞেস করেছিলে ব্রাইট বু কোনটা?

বলো না বাবা, আমি মরে গেলে কেমন হতো?

আঃ লিমা!

তুমি কাঁদতে?

আঃ লিমা, এসব কথা মনে করতে নেই।

তুমি কি সাঁওতাল-মার মতো দেয়ালে মাথা ঠুকতে?

তুমি এমন করলে আমি এখান থেকে উঠে একদিকে চলে যাব।

ঠিক আছে, আর কথা বলব না।

দুজনে আবার হাঁটতে হাঁটতে গাড়ির কাছে ফিরে আসত। সাকিবের দুষ্টুমি তখনো শেষ হয় না। সালমা গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাকিবকে দেখতে ভালো লাগত সালমার। ওর প্রাণশক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করত। আর তা করলেই ভেতরটা কেঁপে যেত। মনে হতো, ও বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দিন দিন ভালোর দিকে এগোচ্ছে। না এগিয়ে উপায় কী? বাবা যে ওকে নিয়ে সাধনায় নেমেছে। ভালো

করে তুলবার প্রচণ্ড সাধনা। সালমা এসবের কোনো অর্থ খুঁজে পেত না। কেন বাবা এমন করে? না করলেই বা কী?

আস্তে আস্তে ভালো হয়ে গেল সালমা। আর বাবাকে কেন্দ্র করে সেই দিনগুলো সালমার জীবনে স্মৃতি হয়ে রইল। গরমের ভীষণ দুপুরে ওই স্মৃতিটুকু ছাড়া বাবাকে কেন্দ্র করে আর কোনো অনুভূতি কাজ করে না। মনে মনে বিড়বিড় করে, তুমি অধ্যাপক জাহিদ চৌধুরীই থাকো। আমার বাবা হতে এসো না।

দরজায় ঠকঠক শব্দ হয়। সালমার বিরক্তি লাগে। দুপুরটা বেশ জমে উঠেছিল। এ সময়ে আবার কে এলো?

দিদিভাই? অ দিদিভাই?

কী?

রকিব ভাই এসেছে।

আসছি।

রকিব এসেছে। মন্দ না। সময়টা কাটবে। রকিব প্রায়ই আসে। এ বাড়িতে ওর অবাধ যাতায়াত। কেউ কিছু মনে করে না। ভয়ে ভয়ে মা কখনো আপত্তি করে, ছেলেদের সঙ্গে বেশি ঘোরাঘুরি ঠিক নয় লিমা।

বেশি কই দেখলে? তাছাড়া ছেলেদের নয়। রকিব ছাড়া কারো সঙ্গে ঘুরি না। আর ঘুরলেই বা কী, নিজের কাছে যে সৎ থাকে সেই সবচাইতে চরিত্রবান ব্যক্তি।

দেখো মেয়ের কাণ্ড। একটা কথা বললাম, অমনি উনি বক্তৃতা শুরু করলেন।

মা বেগতিক দেখে অন্য প্রসঙ্গে যায়। সালমা গজগজ করে।

তোমরা বড্ড সেকেলে। এজন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে আমার মেলে না। দৃষ্টিটা একটু ছড়িয়ে দাও না। যা শিখেছ সেটাই চিরকাল আঁকড়ে থাকবে, নিজে কিছু নতুন করে ভাববে না মা?

তোর মতো একালের মেয়ে আর হতে পারলাম কই?

মা কাজে চলে যায়।

ভাবতে ভাবতে দ্রুত কাপড় পরে নেয় সালমা। চুল আঁচড়ায়। পাউডারের পাফ বুলোয় মুখে। ড্রয়িংরুমে রকিব বসে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টায়। সালমার লঘু পায়ের শব্দ ওর খুব পরিচিত।

কিরে কী করছিলি?

শুয়েছিলাম।

ঘুমোচ্ছিলি?

না।

চল কোথাও থেকে ঘুরে আসি।

চল।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ধানমণ্ডি লেকের পাড়ে আসে। এ জায়গাটা ওদের খুব প্রিয়। প্রায়ই আসে ওরা। বিছিয়ে রাখা গালিচার মতো সবুজ ঘাস। কয়েক হাত দূরে ঝাঁকড়া মাথা গাছ। সামনে লেকের কাঁপুনি জল। দূরে মিরপুর রোড। সালমার মনে হয় এই সেই নির্জন দ্বীপ। কিন্তু কখনো মিরপুর রোড দিয়ে চলে যাওয়া ডবল ডেকার বাস সব এলোমেলো করে দেয়। ভাবনা তলিয়ে যায়। ভালো করে কিছু ভেবে আর বুঝে উঠতে

পারে না। বিকেলের নীলাভ ছায়া লেকের জলে উথালপাতাল। সেদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সালমা।

কিরে দাঁড়িয়ে যে, চল কোথাও গিয়ে বসি।

দাঁড়া একটু। আচ্ছা রকিব, পাস করে তুই কী করবি?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বল না।

পাস করে চাকরি নেব।

তারপর?

তারপর চাকরি করতে থাকব।

ধুৎ। তুই সেই রাজপুত্রের কাছে গল্প বলা রাখাল ছেলের মতো বলছিস। কেবলই ফুড়ৎ।

আর কী করব বল? এমনি করেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে।

শুধু একটা কিছু নয়, আমার অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করে।

ওতে নাকি জীবনে স্থিতি আসে না। শান্তি হয় না।

কে চায় স্থিতি! কে চায় শান্তি! জীবনটাকে অনবরত ঘোলা করে তুলব।

সালমা?

বল।

এমন করে কী লাভ?

লাভ-লোকসান বুঝি না। চল, ওই গাছটার নিচে বসি।

সালমা পা ছড়িয়ে গাছের তলে বসে। পঁড়িতে হেলান দেয়। চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছে করে। রকিব ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়েছে।

সালমা কিছু বলে না। মনে মনে হাসে, রকিবের কি এখন আবাল খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে। রকিব ওর হাতটা নিজের হাতে নিয়েছে।

রকিব অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকায়। একটা কিছু আঁচ করে। দুষ্টুমির ঝলক সালমার সারা মুখে।

কিরে, কী ভাবছিস?

তোর কী এখন আবাল খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে!

যাঃ। কী যে বলিস!

মন্দ কী! এই খোলা মাঠ গাছের নিচ। মনে হবে আমরা দুজন আদম আর ইভ। চারদিকে কেবল অনন্তকালের নীরব প্রকৃতি।

একদম বখে গেছিস তুই।

সালমা জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেয়। হাঁটুর ওপর মুখটা রেখে চুপচাপ বসে থাকে। ফিকে হলুদ রঙের শাড়ি বিকেলের রোদের মতো। সালমার গায়ের হলুদ রঙের সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। হঠাৎ বলে, আচ্ছা, রকিব এখন যদি গাছের ওপর থেকে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী কথা বলে ওঠে?

কী কথা?

যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কোনো জাদুর কাঠি চাই কি না? তাহলে কেমন হয়?

মন্দ না।

জাদুর কাঠির কাছে তুই কী চাইবি?

আমি চাইব–আমি চাইব–এই দেখ কিছু ভেবে উঠতে পারছি। তুই কী চাইবি?

আমি-আমি–সত্যি তো আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। কী চাইবার আছে?

দুজনে হো হো করে হেসে ওঠে।

রোদ একদম নেই। বিকেল শেষ, সন্ধ্যাও পুরোপুরি ঘনায়নি। এমনি একটা মাঝামাঝি সময় ওরা উঠে আবার হাঁটতে থাকে। বাড়ি ফেরা দরকার। কেউ কোনো কথা বলে না। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় আসে। নিরিবিলি রাস্তা। লোক চলাচল কম। আশপাশের বড় বড় বাড়িগুলোর জানালা দিয়ে আলো আসছে। ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। সে ফুলের নাম জানে না কেউ।

গেটের সামনে এসে রকিব থমকে দাঁড়ায়।

ভেতরে যাবি না?

না, কাজ আছে। কাল ইউনিভার্সিটি যাচ্ছিস তো?

দেখি চিন্তা করে।

এমন করলে তুই পাস করতে পারবি না সালমা।

পাস যে করতে হবে এমন কথা কাউকে দিয়েছি নাকি?

সালমা হাসে। রকিব চলে যায়। দোতলার বারান্দায় রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে নাসিমা দাঁড়িয়ে আছে। সালমাকে দেখে হেসে হাত নাড়ে। সালমাও হাসে। কথা বলতে পারে না। বাবা-মা দুজনে বাড়িতে। নাসিমা অনুচ্চ গলায় বলে, কাল সময় পেলে আসিস একবার।

সালমা মাথা নাড়ে। বারান্দায় সাকিব বসে। অবশ্যই বাবা-মার মতো মারমুখী নয়। নাসিমাকে ওর ভালো লাগে। সালমাকে দেখেই সাকিব ডাকে।

শোন দিদিভাই, খবর আছে।

কী? সালমা চেয়ার টেনে ওর কাছে বসে।

বাবা বোধহয় তোর একটা বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করছে। বিকেলে চায়ের টেবিলে সেরকম আলাপ-আলোচনা শুনলাম।

কিসের বন্দোবস্ত? সালমা ভুরু কোঁচকায়।

বুঝতে পারছিস না, বিয়ে—

বিয়ে? আমাকে বলতে এলে দেখাবা

সালমা উঠে পড়ে। ঘুরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। কাপড় ছাড়ে। বাথরুমে যায়, হাতমুখে পানি দেয়। শব্দটা খচখচিয়ে ওঠে মনে। বিয়ে? বিয়ে? অসম্ভব। কখনো মধুর আমেজের মতো লাগে। আবার বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। না, একঘেয়ে ক্লান্তিকর। জীবনটাকে নিঃশেষ করে দেয়। রুবা ভাবির কথা মনে পড়ে। অনেকদিন রুবা ভাবির ওখানে যাওয়া হয়নি। কতদিন হলো? প্রায় মাসতিনেক। রুবা ভাবি ঠিক রাগ করবে। কাল-পরশু একবার যেতে হবে।

টেবিল-বাতি জ্বালিয়ে একটা বই নিয়ে বসে

টেবিল-বাতি জ্বালিয়ে একটা বই নিয়ে বসে। পড়া হয় না। বাতিটা। আবার বন্ধ করে দেয়। কালো অক্ষরগুলো মুছে গিয়ে একটা শব্দ জেগে থাকে। বিয়ে। রুবা ভাবি বিয়ে করেছে এবং প্রতিবছর বিয়ের মাসুল ওঠাচ্ছে। নাসিমা আপা বিয়ে করেনি। বিয়ে না করেও বিবাহিত জীবনযাপন করছে। তাহলে বিয়ের অর্থ? কেমন করে এ শব্দ জীবনের সব সত্যকে উদ্ঘাটন করে? সালমা টেবিলের ওপর পা উঠিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। ঘুরেফিরে রুবা ভাবির কথা মনে হয়। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল ওরা। হাসিখুশিতে ভরা মেয়ে রুবা ভাবি। শিহাব ভাইও ভালো। বিয়ের পাঁচ বছরে চারটে সন্তানের বাবা হয়েছে। চিন্তা নেই। সালমা হাসতে হাসতে বলেছিল, এবার ক্ষান্ত দাও রুবা ভাবি।

পাগল। পেটে বাচ্চা না থাকলে আমার ভালো লাগে না রে। যেদিন বুঝব আর পারি না সেদিন থামব।

সালমা অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়েছিল। গা-টা কেমন ঘিনঘিন করছিল। মন হয়েছিল, রুবা ভাবির সারা গায়ে পোকা কিলবিল করছিল। তখুনি সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল বহুদিন আগের হারিয়ে যাওয়া একটি মুখ। সেই সাঁওতাল-মা। কালো কুচকুচে পেটানো শরীর। বাচ্চা বাঁচত না তার। মনে মনে বলেছিল, তুমিও যদি অমনি হতে রুবা ভাবি তাহলে কেমন হতো? পরে রুবা ভাবিকে বলেছিল, তুমি আমায় অবাক করলে রুবা ভাবি। বিয়ের দায় কি এমনি করে ওঠাতে হয়?

কেন? কেন?

তোমার যদি এতই শখ তাহলে তুমি কুমারী অবস্থায় মা হতে পারনি কেন?

তুই একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছিস সালমা।

ঠিক আছে, না হয় তাই হলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

জানি না।

তখন তোমার পেট খালি লাগেনি?

আঃ, সালমা!

জানি তো উত্তর দিতে পারবে না।

এসব কথা বলতে নেই সালমা।

না, আর বলব না।

সালমার এ ধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন সহ্য করেও রুবা ভাবি ওকে আদর করে। সালমা গেলে কী করবে বুঝতে পারে না। কত কী যে খাওয়ায় তার ঠিক নেই। অথচ রুবা ভাবির বাচ্চাদের সালমা একদম সহ্য করতে পারে না। একটাকে থামালে আরেকটা শুরু করে। মারামারি, হৈচৈ, কান্নাকাটি সে এক বিশ্রী ব্যাপার। সালমা চোখ বুজে সেই কান্না যেন শুনতে পেল। হাসল আপন মনে। তবু রুবা ভাবি বেশ আছে। কোনো চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু রুবা ভাবি যা পারে, সালমা তা পারে না। ওইসব চিন্তা করলে শরীর শিরশির করে।

আপামণি। হরলিকস।

আনুর মা এক গ্লাস হরলিকস টেবিলে রাখে।

বাবা কী করছে আনুর মা?

পড়ছেন।

মা?

রান্নাঘরে।

রাতের রান্না কী?

মাংসের ভুনা, ইলিশ মাছের দোপেঁয়াজি, বেগুন ভাজা।

মন্দ না। তুমি বসো ওইখানে।

সালমার আদেশে আনুর মা মেঝের ওপর বসে পড়ে। আনুর মাকে জানার খুব ইচ্ছে ওর, কিন্তু ও তেমন করে কোনো উত্তর দিতে পারে না। আসলে হয়তো গভীর কিছু ভাবে না।

আচ্ছা আনুর মা, আমাদের সঙ্গে থাকতে তোমার কেমন লাগে?

কেমন-টেমন বুঝি না। পেটের দায়ে থাকি।

তোমার স্বামী নেই, মেয়েটাও কাছে নেই, তোমার খারাপ লাগে না?

সারাদিন কাজে থাকি। রাতে শুলেই ঘুম আসে। আর কিছু জানি। ওই আম্মা ডাকে। আনুর মা একরকম দৌড়ে চলে যায়। সালমার রাগ হয়। কোনো কাজের না। নিজেকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই। বেশি কিছু বোঝেও না। সালমা হরলিকস খায়। টেবিল-বাতিটা আবার জ্বালে। পড়তে বসে। আস্তে আস্তে মনোযোগ বাড়ে। কালো কালো অক্ষরগুলো মনে হয় খুব পরিচিত। ওরাই তো দিনরাত সালমার অন্তরের কাছে বসে কথা বলে।

রাতের খাবার টেবিলে বাবা খুব গম্ভীর হয়ে যায়। কারো সঙ্গে তেমন কথা বলে না। কথা বেশি বলে সাকিব আর। সালমা আড়চোখে বাবার মুখের দিকে তাকায়। ওর ওপর অসন্তুষ্ট হলো কি না বুঝতে পারে না। অল্প একটু খেয়ে উঠে পড়ে।

কী, হয়ে গেল তোমার?

বাবার গম্ভীর কন্ঠ। সালমা থতমত খেয়ে যায়।

এই মাংসটুকু খাও।

খেতে ইচ্ছে করে না।

খেতে হবে।

সালমা আর কোনো প্রতিবাদ না করে বসে পড়ে। মাংস খেয়ে উঠে যায়। বাবা আর কিছু বলে না। খাওয়া-দাওয়ার পর সাকিব বারান্দায় গিটার নিয়ে বসে। সালমা দরজা-জানালার পর্দা খুলে দিয়ে শুয়ে থাকে। ক্রস ভেন্টিলেশনের দরুন ফুরফুরে বাতাস আসছে। এক ঝাপটা করে ফুলের গন্ধও আসে কখনো। বাইরে আমগাছের মাথায় অন্ধকারের মৃন্ময়ী ইচ্ছেগুলো আড়ি আড়ি খেলে। পাতায় পাতায় অশরীরী স্পর্শ। চোখ বুজে থাকতে কী ভীষণ আরাম লাগছে! গিটারের বাজনা ছন্দ তুলে ভাসছে। কখনো মৃদু। কখনো তীব্র। সালমার মনে হয়, ও আস্তে আস্তে এক বিরাট আঙর ক্ষেতে ঢুকে যাচ্ছে। থাকা থাকা রসাল ফলের মতো মাতাল আবেগ ওর অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। ও হাঁটছে। কেবলই হাঁটছে। চারদিকে রসাল ফল। সবুজ পাতা। আর কিছু নেই। ওর মনে হয় কিছুর দরকার নেই। এমনি করে ও অনন্তকাল কাটাতে পারে। সালমা তলিয়ে যাচ্ছে।

তলিয়ে যেতে যেতেও ভুস করে ভেসে ওঠে এক এবং একাধিক শব্দ। ফুরফুরে বাতাস-সাকিবের বাজনা-মৃন্ময়ী অন্ধকার ইত্যাদি সালমাকে নাগরদোলার মতো দোলায়। দোলাতে দোলাতে ঘুম পাড়ায়। দুসপ্তাহ একনাগাড়ে ক্লাস করতে করতে আবার হাঁপিয়ে

ওঠে সালমা। ক্লান্তিকর। বাবার লেকচার, ড. হায়দারের লেকচার, মমতাজ আপার লেকচার কিছুই ভালো লাগে না। পুরনো গৎ বাঁধা পড়া। মোটেই সুবিধে নয়। যেসব বই ঘেঁটে ওরা পড়ায় সেইসব বই সালমা বাসায় কয়েকবার পড়েছে। ওরা কেউ নতুন কথা বলে না। কোনো নতুন দর্শনের কথা বলে সবাইকে চমক দিতে পারে না। ছাত্রছাত্রীর চিন্তাশক্তি আলোড়িত করে না। কপচানো বুলির নোট লিখে, আবার সেগুলো মুখস্থ করে উগরে দিতে হবে। এই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি জুটবে। ভাবতে বিশ্রী লাগে ওর। আবার সেই নসিয়া। মনে হয় বাবা সেই ধরনের পণ্ডিত হোক যে একটা তত্ত্বের প্রবক্তা হিসেবে নাড়িয়ে দিক বিশ্বকে।

বাবা কিছু পারে না। কেননা বাবার মধ্যে ক্ষমতার লোভ, বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার, সভ্যতার মেকি নিষ্প্রাণ আদবকায়দা, অর্থের চিন্তা, নানাবিধ ক্রিয়া সমানভাবে কাজ করে। বাবা নিজেকে জয় করে শক্তিমান হতে পারেনি। মাঝে মাঝে সালমার ভীষণ ইচ্ছে করে একজন শক্তিমান পুরুষের মুখোমুখি হতে, সে শক্তিমানের পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দিতে। অন্যেরা যত কথাই বলুক আসলে বাবা বিদ্বান, কিন্তু জ্ঞানী হতে পারেনি। যে নিজেকে জানে না সে জ্ঞানী হয় কী করে? অন্যকে জেনে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে না জানার অক্ষমতায় সব জ্ঞান চাপা পড়ে। সালমা মনে মনে আবার সেই নিজস্ব প্রার্থনা করে, তুমি জাহিদ চৌধুরীই থাক, আমার বাবা হতে এসো না। তোমার মতো বাবা আমার জীবনে না থাকলেও চলে। আমার মতো মেয়েও তোমার হয়তো খুব একটা দরকার নেই। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পার না। তোমার অক্ষমতা আমার লজ্জার কারণ। তোমার মধ্যে সেই শক্তিমান মানুষ খুঁজে পাই না বলে আমার নসিয়ার মতো লাগে। কী যে বিশ্রী ব্যাপার বাবা, সে তুমি বুঝবে না। যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে একটি আশ্চর্য অনুভূতিও দানা বাঁধে। নিজের সঙ্গে নিজের এক অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়। এ যুদ্ধের কোনো পরিণতি নেই।

সেদিন বিকেলে বাবা-মা দুজনে বাইরে গেল। মা কী ভীষণ সেজেছে! অত উৎকট সাজের প্রয়োজন ছিল কি? এজন্যে মার ওপর রাগ হয় সালমার। রুচিসম্মতভাবে সাজতে জানে না। যা তাকে মানায় না তাই তার করা চাই। বাবাও কিছু বলে না। বলবেই কী? বাবা ভাবে যে-কোনো উপায়ে নিজেকে প্রদর্শনীর সামগ্রী করে তোলাটাই

আর্ট। বাবা এর বেশি কিছু ভাবতে পারে না। মাকে নিজের চিন্তার মধ্যে আনতে পারে না সালমা। মার কড়া কমলা রঙের শাড়িতে চোখ ধাধিয়ে যায়।

আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি লিমা। ফিরতে রাত হবে।

সালমা ঘাড় কাত করে। বসার ঘরে সাকিব মিতালির সঙ্গে গল্প করছে। মিতালি যে এসেছে বাবা-মা কেউ টের পায়নি। সালমা এখন একা একা কী করবে ভেবে পেল না। মনে হলো সুখ-দুঃখের কথা। জলিল মিয়া বাগানে পানি দিচ্ছে। গরুম হওয়া বইছে চারদিকে। সূর্যের তেজ কমেনি। সালমা বাড়ির পেছনদিকে ওর নির্জন পৃথিবীতে এলো। সুখ-দুঃখের বাক্স খুলে বের করে দিলো। ওরা লাফাতে লাফাতে বাগানের ঘাসের আড়ালে অদৃশ্য হলো। পাতা ঝরার পালা শেষ। আমের বোল এসেছে। চমৎকার গন্ধ ভাসছে। আর সব গাছে নতুন পাতা। কচি পেলব। হাত দিয়ে ধরলে মাখনের মতো লাগে। ঝরা পাতার মৌসুম নেই বলে চারদিক ছিমছাম লাগছে। বাগানটাকে মনে হয় অনেক হালকা। কোনো বোঝায় ভারাক্রান্ত নয়। সালমার নিজেরও ফুরফুরে লাগে। আমের বোল ঝরে পড়ে পাতার ওপর। খরগোশ দুটো পায়ের কাছে এসে মুখ ঘষে। আবার দৌড়ে চলে যায় অন্যদিকে। ওরা বেশ খেলায় মেতেছে। অনেক দিন পর আজ ছাড়া পেয়েছে। জলিল মিয়া খরগোশ দুটোর যত্ন করে, কিন্তু সালমা বাগানে না এলে ওদের ছেড়ে দেবার নিয়ম নেই। সালমার ভেতরে ভেতরে কেমন অস্থির লাগে। ওই খরগোশ দুটোর মতো ছুটোছুটি করতে ইচ্ছে করে। ঘাসের বুকে, পাতার আড়ালে লুকিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। নিজের সঙ্গেই নিজের খেলতে সাধ হয়। সালমা আতা গাছটার ছোট কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। দোতলা থেকে হিন্দি গানের সুর ভেসে আসছে। মনে পড়ে, নাসিমা ওকে যেতে বলেছিল। নাসিমা কেন ডেকেছে কে জানে। হয়তো কোনো নতুন রেকর্ড কিনেছে, সেটা শোনার জন্য। এখুনি একবার গেলে মন্দ হয় না। বিকেলটা ভালোই কাটানো যাবে।

সালমা ফিরে আসে। বসার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখে সাকিব নেই। ওর ঘর থেকে দুজনের কথা শোনা যাচ্ছে। বাবা-মা নেই বলে সাকিব মিতালিকে শোবার ঘরে নিয়ে গেছে। সালমার হাসি পেল। ওদের বিরক্ত

করে সিঁড়ি দিয়ে চুপচাপ উঠে গেল। বাইরের দরজা খোলা। ভেতরের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ বলে ঘরের মধ্যে আঁধার আঁধার ভাব। নাসিমা ডিভানের ওপর কাত হয়ে শুয়ে আছে। পিঠের ওপর কুচকুচে কালো চুলের গোছা ছড়ানো। মুখে কেমন একটা হাসি।

সালমার অন্যরকম লাগে। চেঞ্জারে বেহালা বাজছে।

আয় সালমা, বোস।

সালমা একধারের সোফায় বসে।

এই মিউজিকের রংটা খুব সুন্দর না?

মিউজিকের রং?

হ্যাঁ, তুই দেখতে পাচ্ছিস না? ওই দেখ কেমন বেগুনি রং পরাগ হয়ে ছড়িয়ে গেছে সারাঘরে।

কী যে বলো নাসিমা'পা।

ঠিকই বলি। তুই একটা হাঁদা মেয়ে।

নাসিমা কথা বলে বাহুতে মাথা চেপে রাখে। সালমা অসহায় বোধ করে। উঠবে না বসবে বুঝতে পারছে না। বেহালা শেষ হয়ে গেছে। বাঁশির একটা রেকর্ড বাজছে এখন। নাসিমা মাথা তোলে।

দেখছিস সালমা, কেমন ধূসর রঙে ভরে গেছে সব দিক।

সালমা হা না কিছু বলল না। কথা বলা বৃথা। শোবারঘরে থেকে সাব্বির ভাই এলো টলতে টলতে। সালমাকে দেখে হাসল। হেই করে শব্দ করল। ফ্রিজ খুলে দুই বোতল পানি খেল। তারপর আবার চলে গেল। এতক্ষণে সালমার অস্বস্তি লাগা শুরু হয়েছে। বুঝল দুজনেই নেশাগ্রস্ত। কিন্তু কী খেলে মিউজিকে রং দেখা যায়? ভীষণ উত্তেজনা বোধ করে। এ জিনিস খেতেই হবে। নাসিমা আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে। কুচকুচে কালো চুলের ঝরনা নেমেছে ডিভানের গা বেয়ে। উপুড় হয়ে পড়ে থাকায় সাদা পিঠ দেখা যাচ্ছে। ব্লাউজের অর্ধেক বোতাম খোলা। হাত দুটো শিথিল। ঝুলছে। সালমা তাকিয়ে আছে; কিন্তু কোনো কিছুই দেখছে না। মাথার মধ্যে ঘুরছে একটি শব্দ। মিউজিকের রং? এ বোধ ওকে পেতেই হবে। মিউজিকে রং না দেখলে সালমা আর টিকতে পারছে না। হাতের ম্যাগাজিনটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝের ওপর। চুপচাপ পা ফেলে বেরিয়ে আসে। সাকিবকে জিজ্ঞেস করা যায়। ও কি জানে কী খেলে মিউজিকে রং দেখা যায়!

সাকিবের ঘরের সামনে এসে থমকে যায় সালমা। দরজা বন্ধ। সাদা ধবধবে পর্দা বাতাসে দুলছে। সাকিবের নিস্পাপ চেহারার মতো ভেতর থেকে হাসির শব্দ আসছে। সালমার রাগ হয়। চনচনিয়ে ওঠে সাদা রাগ। দরজার গায়ে লাথি মারে।

কে?

ভীষণ মোটা গলা সাকিবের! এমন করে তো ও কখনো কথা বলে। আজ কেন বলছে? তবে কি ও মিতালির গা থেকে সুগন্ধি বের করে নেশা করছে? সালমা একদম চুপসে যায়। মন খারাপ হয়ে যায় ওর। সাকিব নেশাগ্রস্ত। এখন কিছুতেই দরজা খুলবে না। সালমা বোকার মতো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা এখন মিউজিকে রং দেখতে পাচ্ছে। সালমার বিষণ্ণ মুখটা কালো হয়ে আসে। সাকিব দরজা খোলে না। ওই একটা শব্দ মোটা গলায় উচ্চারণ করে চুপ করে যায়। ওর কোনো গরজ নেই, যেহেতু দরজার গায়েও আর কোনো শব্দ নেই। যে পর্দাটাকে সাকিবের চেহারার মতো নিস্পাপ মনে হয়েছিল তার রং বদলে যায়। বারান্দায় এমাথা-ওমাথা জুড়ে পায়চারি করে।

সালমা একসময় সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। জলিল মিয়া এখনো বাগানে কাজ করছে। বিরাম নেই লোকটার। করতোয়া পাড়ের ছেলে। গায়ের মধ্যে নদীর মতো শক্তি। ফুলে

ফুলে উঠে বান ডাকিয়ে দেয়। গেট দিয়ে হাফিজ ঢোকে। এ বাসায় প্রায়ই আসে ছেলেটা। সোজাসুজি সামনে এসে দাঁড়ায়। শরীরজুড়ে একটা দীন ভঙ্গি। ওকে দেখলে রাগ হয় সালমার।

স্যার নেই?

না।

কোথায় গেছেন?

ফাংশনে।

কখন ফিরবেন?

রাত হবে।

ও তাহলে যাই।

ঘুরে দাঁড়ায় ছেলেটি। বিনীত ভঙ্গিটা সালমার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। অসহ্য! ছেলেটা চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সালমা ডাকে।

শুনুন।

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। বাবার কাছে আপনার কী দরকার?

স্যার বলেছিলেন আমাকে একটা চাকরি দেখে দেবেন। একটা চাকরি আমার খুব দরকার।

বেশ তো ভালো কথা। চোখা ছেলের মতো চোখেমুখে কথা ফোঁটাতে পারেন না? অমন জবুথবু হয়ে থাকেন কেন?

মানে–কী বলছেন?

এমএ পাস করেছেন?

হ্যাঁ, গত বছর। স্যার আমাকে খুব ভালো জানেন। আমি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম।

ও সেই কাগুজে ডিগ্রি। এজন্যে রোজ রোজ স্যারের পায়ে ধরতে আসেন।

কী বললেন?

বাবা আপনাকে কোনোদিন চাকরি করে দেবে না।

উনি কথা দিয়েছেন।

তাতে কী? ওরকম কথা উনি অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে দেন। দেখেন না, বাবা বক্তৃতায় এ কথা বলে, কাজে আর এক কথা করে।

হাফিজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। স্যারের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন?

আপনারা এমনি পাশ কাটিয়ে যান বলে আর কিছু ভাবতে পারেন। আপনাদের মতো ছেলেদের মাথা ভাঙিয়ে বাবা খায়। আপনি না অনেকদিন বাবার বক্তৃতা লিখে দিয়েছেন, প্রবন্ধ লেখাতে সাহায্য করেছেন? বিনিময়ে কী পেয়েছেন? আপনাদের মতো ছেলেদের মাথাগুলো হলো সিঁড়ি। তার ওপর পা রেখে আমার বাবা ওপরে ওঠে। যতদিন আপনাকে প্রয়োজন ছিল ব্যবহার করেছে। এখন নেই। এজন্যে বাবা আপনার

দিকে ঘুরেও তাকায় না। বাবার পিছে পিছে ঘুরে এবার নিজে নিজে একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা করুন।

সালমা হাফিজকে উপেক্ষা করে বাগানে চলে যায়। একটুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে গেট খুলে বেরিয়ে যায় হাফিজ। গেটটা খোলাই থাকে। হতাশ মর্বিড টাইপের ছেলেদের মোটেই পছন্দ হয় না সালমার। ওরা বেপরোয়া না হয়ে অনবরত নত হতে থাকে। বাবার কাছে কেবল আসে আর যায়। একদিনও বাবার সামনে চোখ তুলে কথা বলতে পারল না। জোর দিয়ে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। বাবা যা বলে তা শুনে চলে যায়।

কামিনী ফুলগাছটার নিচে জলিল মিয়া বিশ্রাম নিচ্ছে। বাগানের কাজ আজকের মতো শেষ। সালমা রক্তকরবী গাছটার নিচে দাঁড়ায়। পেছনের আমড়া ডালে একটা চমৎকার ঘুঘু বসে আছে। সালমা আগ্রহ নিয়ে দেখে। পাখিটার ঘাড়ের চারপাশে কলার আছে এবং তার ওপরে নিচে দুটো সাদা ডোরা আছে। গায়ের রং হালকা বাদামি। মাথায় ধূসর রঙের ওপর কিছুটা জলপাই রঙের ছাপ আছে। সালমা মনে মনে ভাবে, ঘুঘুটা ডাকে না কেন? ডাকলে বেশ হতো। মিশন হাসপাতালে উদাসী দুপুরগুলো ফিরে পেত যেন। ফিরে পেত কৈশোরের কতকগুলো টুকরো টুকরো স্মৃতি। আশ্চর্য, শুধু একটি শব্দ দিয়ে বিস্মৃত অতীতকে কেমন অনায়াসে ফিরে পাওয়া যায়। গোটা ছবিটা এক ঝলকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনমনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় সেই কৈশোরটা ডেকে উঠেছে ঘুঘু-ঘু-ঘুঘু।

কী দেখছ আপামণি?

পাখি।

পাখি? এটা তো পরী ঘুঘু। খুব সুন্দর না?

তুমি অনেক পাখি চেনো, না জলিল ভাই?

পাড়াগেঁয়ে মানুষ, পাখি চিনব না? ছোটবেলায় বাটুল দিয়ে কত ঘুঘু মেরেছি। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কেবলই তো পাখি খুঁজতাম।

ইস, আমার যদি তোমার মতো একটি ছোটবেলা থাকত!

জলিল মিয়া হাসে। সে হাসিতে সালমার বুকটা শূন্য হয়ে যায়। কী যেন পাওয়া হয়নি জীবনে অনেক কিছু দেখাও হয়নি। শুধু চোখের দেখা নয়। নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আপন করে দেখা। ওই ঘুঘুর গাজুড়ে যেমন সাদা ফোঁটা, তেমনি ফোঁটার মতো শূন্যতা থৈথৈ করছে অন্তরজুড়ে।

আবার কী ভাবো আপামণি?

তোমার গল্প বলো জলিল ভাই।

আমার আবার কী গল্প!

কেন তোমার তো কত কথা আছে। খেয়া বাইতে, মাছ মারতে, বাড়ি থেকে পালিয়ে যাত্রা শুনতে, বরদার সঙ্গে প্রেম করতে

এসব আবার একটা কথা নাকি?

আচ্ছা জলিল ভাই, ছোটবেলায় তুমি খুব ডানপিটে ছিলে না?

খুব। কারো কথা শুনতাম না। যা খুশি তাই করতাম। এই খামখেয়ালি মনটার জন্য আমি জ্বলে-পুড়ে শেষ হয়ে গেছি আপামণি।

জলিল মিয়া বিড়ি ধরায়। সালমার মনে হয় জলিল মিয়ার চুল যেন আরো পেকেছে। সাদার ভাগই বেশি। খামখেয়ালি মন নিয়ে কেবল কি জ্বলে-পুড়েই মরে মানুষ? জলিল মিয়া কি বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ করছে? সালমা বুঝতে পারে না কিছু।

জলিল ভাই বরদা এখন কী করে?

কী আর করবে। ভাইয়ের সংসারে আছে। কচুর শাক, কলমিলতা বিক্রি করে দিন চালায়। জানো আপামণি, বরদা আমাকে খুব ভালোবাসত। কতদিন আমার বুকে মাথা রেখে কেবলই কেঁদেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছেই হেরে গেল ও। কিছুতেই পারল না ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছিলাম গাঁয়ে থাকব না, অন্য কোথাও চলে যাব। তাও রাজি হলো না।

আমড়া ডালে ঘুঘুটা তখনো বসে আছে। জলিল মিয়া সেদিকে তাকিয়ে থাকে। বিড়িটা শেষ হয়ে এসেছে। কোনো একটা মেয়ে জলিল মিয়াকে ভালোবেসে পরে বিয়ে করেনি। এজন্যে তার মনে অনেক দুঃখ থাকতে পারে, সালমার তাতে কিছু এসে যায় না। জলিল মিয়ার ছেলেবেলাটাই বেশি ভালো লাগে। বর্ষার করতোয়ায় জাল ফেরে মাছ ধরার দৃশ্য কল্পনা করতে করতে শিউরে ওঠে ও। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে কাদাপানি ভেঙে মামার বাড়ি চলে যাওয়াটা আশ্চর্য লাগে। এমন দিন সালমার জীবনে একটাও আসেন্Pি পাখি খুঁজতে খুঁজতে গভীর বনে। হারিয়ে যায়নি ও। সাতসকালে গোসাইবাড়ির বিছানো বকুল ফুল পাগলের মতো দুহাতে তুলে কেঁচড় ভরেনি। মনে হয় অনেক কিছু বাকি রয়ে গেল। এই না করতে পারার বেদনা শূন্যতা হয়ে কষ্ট দেয়।

ওই লোকটা একটা বিরাট ফাঁকিতে পড়েছিল বলে এখন অনুতাপ করে। কিন্তু কেন? ওর মতো বৈচিত্র্যময় জীবনই বা কয়জনের হয়? সালমা ভাবল, আসলে কোনোকিছু নিয়েই অনুতাপ করা ঠিক নয়। প্রত্যেক ঘটনাকে যদি নিজের কাজের অঙ্গীভূত করে না নেওয়া যায় তাহলে দুঃখ বাড়ে। বুক ভেঙে আসতে চায়। যে যা করে তা তার নিজ দায়িত্বে করে। তার জন্য আবার অনুতাপ কিসের? সেটা নিজের দুর্বলতার লক্ষণ। সালমার মোটেই পছন্দ নয়। শ্বেতকরবী গাছের ডালে একজোড়া বুলবুলি লাফাচ্ছে। সাদা ফুলগুলো বুক চিতিয়ে হাঁ করে আছে। সালমা সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, তুমি অনেকদিন গ্রামে যাওনি জলিল ভাই?

যতদিন বরদা বেঁচে থাকবে, ততদিন গ্রামে যাব না।

কোনো মানে হয় এসব সেন্টিমেন্টের!

কী বললে?

বললাম তুমি একটা কাপুরুষ। কী এমন অন্যায় করেছ যে পালিয়ে বেড়াতে হবে?

না, পালানো নয় আপামণি। ওর জন্য যাব না। গতবার যখন গেলাম তখন খুব কেঁদেছে। আমি গ্রামে গেলে দশজনে ওকে দশ কথা বলে। অপবাদ দেয়।

তাতে তোমার কী? আর একটু সাহসী হলে তো ওই অপবাদ ওর জন্য আশীর্বাদ হতো।

ওইসব কথা থাক আপামণি।

আমি একবার তোমার সঙ্গে গ্রামে যাব। দেখব তোমার। ছেলেবেলাটা খুঁজে পাই কি না।

জলিল মিয়া হো হো করে হাসে। সালমা চুপ করে থাকে। আনমনে তাকায়। কখন যেন আমড়ার ডাল থেকে ঘুঘুটা উড়ে চলে গেছে। বিকেল নাচছে কৃষ্ণচূড়র পাতায়। গোলাপি চেরিফুলের গাছটা যৌবনে ফেটে পড়ছে। ডালগুলো নুয়ে গেছে। জলিলের হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হয়ে যায় সালমা। ওই হাসি কোনোদিন দেখেনি। আস্তে আস্তে বলে, সত্যি বলছি জলিল ভাই, আমি তোমার সঙ্গে একবার গ্রামে যাব। একটু মিথ্যে নয়।

যেয়ো, আপামণি যেয়ো।

জলিল মিয়া অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। করতোয়া পাড়ের গ্রামে তখন শেষ বিকেলের আলো। বাঁশঝাড়, কদবেল গাছ, বনবরির ঝোপ এড়িয়ে চিকন রাস্তা গিয়ে নেমেছে নদীর পাড়ে। পায়ে পায়ে বাজে ঝরাপাতার শব্দের নূপুর। চারদিকে গাছগাছালি ঘাস-লতাপাতা-ফুল মাথা নাড়িয়ে চলেছে। সালমার কানে নদীর শব্দ স্পষ্ট হয়ে। ওঠে। ভরাট নদী। চিকচিকে বালি। এবড়ো-থেবড়ো পাড়। সুরভি মাখানো বাতাসের আস্বাদ

পায় সালমা। ছটফট করে ওঠে মন। উঠে হটতে থাকে। বারান্দায় উঠে আসে। বাবা-মার ঘরে টেলিফোন বাজছে। অনেকক্ষণ বাজার পর সালমা এসে টেলিফোন ধরে।

হ্যালো।

কে বলছেন?

আমি সালমা। আপনি কাকে চান?

আপনাকেই।

আমাকে?

হুঁ।

আপনি কে?

চিনবেন না।

আমাকে কিছু বলবেন?

দেখুন, আমার খুব নিঃসঙ্গ লাগছে। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সালমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এতক্ষণ দম আটকে আসছিল।

আপনি কী করছিলেন?

বাগানে বসেছিলাম।

জানেন টেলিফোন নাম্বার ঘোরাতে ঘোরাতে আমার মনে হয়েছিল যে একটি মেয়ে পাব, যে এক সেকেন্ডে আমার মুহূর্তগুলো ভরে দিতে পারে।

কত জায়গায় চেষ্টা করেছেন?

অনেক। কোথাও শুনতে পাই বাঁজখাই কন্ঠ, কোথাও চাকরের গলা, কোথাও বাচ্চা ছেলে। বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেব ভাবছিলাম। এমন সময় আপনাকে পেলাম।

বেশ মজা।

শব্দ করে হাসে সালমা। ওর মনে হয় ওর ভেতরকার সেই বিষণ্ণ ভাবটা অনবরত বেরিয়ে যাচ্ছে। বুকটা ঝরঝরে লাগছে।

তোমার খারাপ লাগছে না রে সালমা?

না। তোমার?

সালমা দুঃসাহসী হয়ে নিজেও তুমি বলে। দেখা যাক না খেলাটা কতটুকু জমে ওঠে।

অদৃশ্য লোকটা যদি বিনা দ্বিধায় ওকে তুমি বলতে পারে, তবে ও পারবে না কেন?

আমার–আমার যে কেমন লাগছে তা আমি তোমাকে বোেঝাতে পারব না সালমা। আমি আবার কমার্সের লোক কি না, যোগ-বিয়োগের হিসাবটা বেশি বুঝি। নিজের নিঃসঙ্গতা রঙিন করে ভরিয়ে তোলার মতো ভাষা আমার জানা নেই।

সবসময় ভাষা দিয়ে কি কাজ হয়?

তা হয় না। তবু টেলিফোন যখন, তখন ভাষাটাই অবলম্বন করতে হয় বৈকি।

তুমি বেশ লোক।

কেন?

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার।

অপর প্রান্ত থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসে। চমৎকার ভরাট গলা। ভঙ্গিটা নিভাঁজ। সালমা মনে মনে সেই অদৃশ্য ব্যক্তির চেহারার একটা ছক কাটে। নাক, চোখ, মুখ, ভুরু, চিবুক, চুল, হ্যাঁ ঠিক এরকম হতে পারে। রংটা শ্যামলা। দীঘল চোখে অনেক ভাষা। নিঃসঙ্গতা যাকে যাতনা দেয় তার মধ্যে নির্ঘাত একটা ভাবুক মন আছে। সে মন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে। সে ফেরারি মনের কি ঠিকানা আছে?

সালমা।

ধক করে ওঠে সালমার বুক। কে যেন খুব কাছে থেকে প্রিয় নামে ডাকল। উষ্ণ সান্নিধ্যে ভরা সেই কন্ঠ। একটু থেমে সালমা উত্তর দেয়।

বলো।

চুপ করে গেলে কেন?

তুমিও তো কিছু বলছ না। ও হ্যাঁ, শোনো, তুমি কিন্তু বেশ আমার নামটা জেনে নিয়েছ। এবার তোমার নামটা বলল।

না-ইবা জানলে। থাক না।

মন্দ বলোনি। না জানার মধ্যে মাধুর্য বেশি।

আবার হাসি। হাসির শব্দ মাতিয়ে তোলে সালমাকে।

তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

মোটেই না।

কেন? কেন?

বাঃ, তুমি দেখছি একরেই সব জানতে চাও।

ও তাই তো, আস্তে আস্তে সব জানা উচিত। তুমি কী করো সালমা?

পড়ি।

কী পড়?

অনার্স থার্ড ইয়ার।

কোন বিষয়ে?

দর্শন। তুমি কী করো?

চাকরি।

কী চাকরি?

ধরো ছোটখাটো একটা কিছু।

তার মানে তুমি বলবে না।

আবার হাসি শোনা যায়।

সালমা আমার নিঃসঙ্গতা কেটে যাচ্ছে। মনে হয় তোমার সঙ্গে থাকলে আমি কোনোদিন নিঃসঙ্গ হব না।

যাঃ বাজে কথা! সব মানুষই ব্যাসিকালি নিঃসঙ্গ। তাকে ভরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। আমার মোহ যখন কাটবে তখন তুমি আবার নিঃসঙ্গ হবে। ক্লান্তিতে পেয়ে বসবে তোমাকে।

তুমি তো অনেক বোঝ দেখছি। তুমি বলে দাও সালমা, আমার এ অনন্ত শূন্যতা কী দিয়ে ভরাব?

জানি না।

তুমি জানো।

জানি না।

সালমা–প্লিজ।

আমি জানি না, জানি না, জানি না।

সালমা?

শূন্য কন্ঠ ভেসে আসে ওপার থেকে। মনে হয় এই মুহূর্তে সবকিছু হারিয়ে লোকটা নিঃস্ব হয়ে গেল। আর কোনো কথা বলতে পারছে না।

চুপ করে গেলে কেন?

এবার তুমি কিছু বলো।

কী খেলে মিউজিকের রং দেখা যায় তুমি জানো?

জানি।

বলো?

মারিজুয়ানা।

তুমি খেয়েছ কখনো?

নিয়মিত খাই।

লাইনটা কেটে যায়। সালমা আর যোগাযোগ করতে পারে না। যন্ত্রটার ওপর রাগ হয়। কেন যে কেটে গেল লাইনটা! অনেকক্ষণ বসে থাকে। ভাবে হয়তো আবার ফোনটা বাজতে পারে। কথায় কথায় নাম্বারটা রাখা হয়নি। রাখলে ও নিজেই যোগাযোগ করতে পারত। হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। মারিজুয়ানা? মারিজুয়ানার কথা আর জানা হলো না। দশ-পনেরো মিনিট বসে থাকার পরও টেলিফোন এলো না। দেয়ালে টাঙানো বাবা-মায়ের বড় আকারের বাঁধানো ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে সালমা। মনে হয় ওর চোখের সামনে ওই ছবিটার রং ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। সাদা এবং কালো ছবিটা রঙিন হয়ে গেছে। বাবার মুখটা প্রকাণ্ড তিমির মতো দেখাচ্ছে। মা হয়ে গেছে ছোট্ট একটা সোনালি মাছ। পেছনের দেয়ালটা সাদা সমুদ্র যেন। সালমা অপলক তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। টেলিফোন বাজে। সালমার বুকটা ধক করে ওঠে। সেই অদৃশ্য বন্ধু যদি হয়?

হ্যালো?

জাহিদ চৌধুরী আছেন?

না, বাইরে গেছেন।

কখন ফিরবেন?

রাত দশটার দিকে।

আপনি ওনার কে হন?

কেউ না।

একটা খবর ছিল বলতে পারবেন?

না।

সালমা টেলিফোন রেখে দেয়, বিরক্ত লাগে। এই কন্ঠ তো শুনতে চায়নি। যাকগে। কিন্তু লোকটাকে ও মিথ্যে কথা বলল কেন? সত্যি কি জাহিদ চৌধুরী ওর কেউ হয় না, সালমা বুকের ওপর হাত রাখে। হৃৎপিণ্ড এক তালে ধুকধুক করছে। জাহিদ চৌধুরী কেউ না হলে এ শব্দ পেল কোথা থেকে? তবু শরীর ঝাকিয়ে ও অস্বীকার করল সত্য। জাহিদ চৌধুরী ওর কেউ না, কেউ না। ওই নামটা একটা পোকার মতো লাগে। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ও। বারান্দার বাতিটা বন্ধ করে দেয়। আলো ভালো লাগছে না। এখন চাই অন্ধকার-মৃন্ময়ী অন্ধকারের সখী খেলা। সাকিবের ঘরে আলো নেই একটু পরে খুট করে দরজা খুলে ওরা বেরিয়ে আসে। বারান্দায় ওকে দেখে দুজনে অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

অন্ধকারে কী করছিস দিদিভাই?

এমনি হাঁটছি।

মিতালি তোর সঙ্গে গল্প করতে চাইছিল—

হ্যাঁ সালমা আপা, আপনি যেন কোথায় উধাও হলেন। ওর কথার মধ্যে ছেলেমানুষি ভঙ্গি আছে। সাকিবের সঙ্গে বেশ মানায়। সালমা হাসে। ওর কথার উত্তর দেয় না। জানে বড় বোনের মান রাখতে ও কথা বলেছে সাকিব। ওইটুকু তো ভদ্রতা। নইলে আর কী। মুখে অমায়িক হাসি টেনে বলে, তুমি একলা কী করে যাবে মিতালি?

আমি ওকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কাছেই তো।

সাকিব চটপটে উত্তর দেয়।

আসি সালমা আপা।

সালমা হেসে মাথা নাড়ে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে ওদের। বিদায় দেয়। ওরা চলে যেতে যেতে কী যেন কথা বলে আর হাসে। ওদের আচরণে ছেলেমানুষি চপলতা। সালমার বেশ লাগে। পাতলা ছিপছিপে মিতালি প্রায় সাকিবের সমান সমান লম্বা। মাথায় ববকাট চুল। শ্যাম্পু করা। কেমন মসৃণ ওর চুলের গোছা। মিতালি নির্জন দ্বীপের গানের পাখির মতো। ও দুঃখ ভুলিয়ে দিতে পারে। সালমা মনে মনে সাকিবের প্রশংসা করল। চমৎকার পছন্দ ওর। সঙ্গী হিসেবে এমন একজন পছন্দ করেছে, যে সামনে এসে দাঁড়ালে বেদনা কমে যায়। অহেতুক গান আসে মনে। মিতালি অবলীলায় সাকিবের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। হয়তো ওদের বিয়ে হবে। হয়তো হবে না। তাতে কী এসে যায়! যৌবনের গন্ধ কখনো ফুরায় না। সে গন্ধের বৃত্ত ছন্দ রচনা করে। অন্যত্র সুখ খোঁজে। পথে টেনে নিয়ে আসে। ভরিয়ে তোলে নতুন পেয়ালা। ভাবতে ভাবতে সালমার নেশা ধরে। বুক চেপে আসে। মনে হয়, ঠিক এ মুহূর্তে, এখন কাউকে চাই। নইলে ব্যর্থ হয়ে যায় লগ্নের খেলা। আঃ, কী কষ্ট! সালমা মনে মনে উচ্চারণ করে। অস্থির লাগে। চিৎকার করে কাউকে ডেকে নিয়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। রকিবের কথা মনে হয় ওর। কখনো রকিবের দুচোখ জ্বলে ওঠে, কখনো সালমার হাত ধরে অনুনয় করে। সেই আর্তিটা আজ স্পষ্ট কানে বাজে। সালমার মনে হয় কে যেন দরজার গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘন্টা বাজাচ্ছে। খুব মৃদু সে ধ্বনি। যেন কিসের মঙ্গলবার্তা বলে যাচ্ছে, ঘন্টা হাতে লোকটা এগিয়ে আসছে। সালমা একদৃষ্টে তাকিয়ে

থাকে। নিভে। যায় একশ পাওয়ারের বাল্ব। অন্ধকারে ফিসফিস করে সে বলে, আমি এসেছি।

নিবিড় অন্ধকারে মমতাময়ী হয়ে সালমাকে ঘিরে রাখে। এক টুকরো আলো শুধু একটা মুখের ওপর ঝুলে আছে। হাতে তার ঘন্টা। একটানা বেজে চলে।

সালমা হাত বাড়ায়। সমুদ্রের ওপর থেকে স্নিগ্ধ হাওয়া বয়ে যায়। অদ্ভুত ঠান্ডা। কোথাও আলো নেই। এখন অন্ধকারই আপন। আর কিছু চাই না। আর কিছু না।

সালমা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। বাইরে জানালার ধারে ওর নির্জন দ্বীপ। সে দ্বীপ ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। অজস্র অসংখ্য ফুলে ছেয়ে যায়। এত ফুল একসঙ্গে সালমা কোনোদিন দেখেনি। এত বিচিত্র রঙের সমাবেশ আর কখনো চোখে পড়েনি। সালমার মনে হয় ফুল ছাড়া আর কিছু সত্য নয়। ফুল আনন্দ। ফুল বেদনা। হাসি-কান্না সব। আস্তে আস্তে কোমল প্রশান্তিতে ভরে ওঠে মন। কোথাও বেদনা নেই। জ্বালা নেই। ছড়ানো ফুলের মতো অনুভূতির সব রং মিলেমিশে এক হয়ে আছে। ভিন্ন রঙে তার কোনো প্রতিভাস নেই।

সালমা বালিশে মুখ গুঁজে দেয়।

সকালে ছিমছাম করে নিজেকে সাজায় সালমা। আজ মনটা বেশ আছে। ভয়ানক হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। কপালে লাল টিপ দিতে দিতে মনে হয় লাল টিপ রকিবের খুব পছন্দ। আজ ওরা দুজনে অনেক দূরে যাবে। রকিব কিছু বলেনি। শুধু বলেছে যাবার জন্য। সালমার একঘেয়ে লাগছে। কোথাও যেতে পারলে ভালো লাগত। দশটায় রকিব বলাকার সামনে আসবে। ওখান থেকে দুজনে যাবে। সালমা গান গাইতে গাইতে চুল বাঁধে। মা এসে সামনে দাঁড়ায়।

বেরোচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ।

তোর সঙ্গে কথা ছিল।

বলো।

সালমা ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ে।

বলছিলাম কী জহিরকে তোর কেমন লাগে?

কেন?

না মানে তোর বাবার খুব পছন্দ কি না।

যা বলবে খোলাখুলি বল–

জহিরকে তোর জন্য পছন্দ করেছে তোর বাবা। এখন তোর মতামত পেলে আমরা কাজে এগোতে পারি। ছেলেটি কিন্তু খুব ভালো। তোর বাবার ভক্ত।

তাহলেই হয়েছে।

কী?

ওই যে ঘুরেফিরে এক কথা। ভালোর সংজ্ঞা মানে অধ্যাপক জাহিদ চৌধুরী।

কী বলছিস লিমা?

ঠিকই বলেছি। তোমরা অন্ধ, তাই ভালো-মন্দ বুঝতে পার না। বাবার মতো ছেলে আমার কোনোদিনই পছন্দ না।

নিজের বাবা সম্পর্কে–

তুমি আমাকে বেশি কিছু বলার সুযোগ দিয়ো না মা।

তোর মতটা বল?

মত নেই।

ও।

মা কেমন অপমানিত বোধ করে। মুখটা লাল হয়ে যায়। তবু কিছু বলতে পারে না। সালমাকে বড় ভয়। মাঝে মাঝে মা কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। অবাক লাগে। সালমাকে চেনে বলে মনে পড়ে না। কোনোদিন ওকে দেখেছে বলেও মনে হয় না। সালমা মার মুখের দিকে তাকায়। মা উঠে যেতেই সালমা বলে, শোনো মা, আর কোনোদিন আমাকে এসব কথা বলতে এসো না।

মা আর কোনো কথা না বলে চলে যায়। সেই বেদনাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়েও সালমার মায়া হয় না। সম্পর্কের অধিকারের সুতোটা বড় জঘন্য। ওটা গলায় পরাতে চাইলেই ও নির্মম হয়ে ওঠে। মা বেরিয়ে যাবার পরও সালমা গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। জাহিদ চৌধুরী নামটা ভাবলেই সালমার মনে হয় একটি ফাঁকির পাহাড়। লোভের রক্তপিণ্ড। খ্যাতির পঙ্কে ডুবে যাওয়ার বাসনা-পোকা। এছাড়া জাহিদ চৌধুরী আর কী? মৌলিক কিছু করার ক্ষমতা তো নেই তার। কেবল চর্বিত চর্বণের বাহাদুরি দেখিয়ে দুহাতে হাততালি লুটছে। আসলে নিজের সম্পর্কে যার কোনো বিবেচনা নেই, অহেতুক বাহাদুরি নিতে যার ঘৃণা নেই, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্বীকার করতে সালমার ঘৃণা। সালমার মাথাটা ঝাঁকিয়ে ওঠে। বেড়াতে যাবার আনন্দটা বুঝি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আবার সেই ধূসর বিষণ্ণতা পেয়ে বসে সালমাকে। খরগোশের লোমশ শরীরের মতো ধূসর বিষণ্ণতা বাড়তে থাকে। যন্ত্রচালিতের মতো ও উঠে চুল বাঁধে। শাড়ি পরে। স্যান্ডেলে পা ঢোকায়। এবং একসময় ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। চারদিকের

লোকজন গাড়ি, রিকশা–সবকিছুর মধ্যে ধূসর বিষণতা অনবরত জমতে থাকে। সালমার আর কিছু ভালো লাগে না।

রকিব ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, কিরে এত দেরি কেন?

সালমা বলে, তোর মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছে রকিব।

রকিব অবাক হয়, কেমন?

ঠিক তিমি মাছের পিঠের মতো।

সালমা শব্দ করে হাসে। রকিব ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সালমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে। ও মাঝে মাঝে এমনি খেয়ালি হয়। তখন ওকে অসুস্থ দেখায়। অসুখী মনে হয়। উদাসীন সালমার কোনোকিছুতে ভ্রুক্ষেপ থাকে না। আজো ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে ওকে।

কোথায় যাব আমরা?

শহর থেকে অনেক দূরে।

চল।

স্কুটার ঠিক করা ছিল। দুজনে উঠে বসে। বাতাসে চুল ওড়ে সালমার। শাড়ির আঁচল রকিবের মুখে এসে লাগে। পেরিয়ে যায় শহরের কোলাহল। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় কমে আসে। চারদিকে সবুজ। যতদূর চোখ যায় বিচ্ছিন্ন সবুজ অংশ নির্জন দ্বীপের মতো প্রতিভাত হয়। বদলে যায় সালমার মন। দখিনা বাতাসের মতো চমৎকার এক ভালো লাগা শরীরের ফোকর গলিয়ে সবখানে ঢুকে পড়ে। মাতিয়ে তোলে ওকে। সেই ধূসর বিষণ্ণতা সবুজ দৃশ্যাবলির সামনে তলিয়ে যায়। জেগে ওঠে নীলাভ সমুদ্র।

সালমা রকিবের হাত ধরে, আমার খুব ভালো লাগছে রকিব।

সত্যি?

হুঁ।

রকিব ওর পিঠের ওপর হাত দিয়ে কাছে টানে।

আমরা দুজন আর কখনো এমন করে বেরিয়ে পড়িনি।

না। রকিব আলতো চাপ দেয়।

আমরা অনেক আনন্দ মুহূর্ত নষ্ট করেছি।

হয়তো তাই।

স্কুটার এসে থামে ডাকবাংলার সামনে। বাগানের চারদিকে রক্তজবার সমারোহ। মাধবীলতার ঝড় উঠেছে গেটের দুপাশে। মৌসুমি ফুলে ছেয়ে আছে চারদিক। সালমা কী করবে ভেবে পায় না। দুজন বারান্দায় উঠে আসে। দারোয়ান দরজা খুলে দেয়। রকিব ওর হাত। ধরে।

ভালো না জায়গাটা!

চমৎকার জায়গা। তুই কেমন করে খোঁজ পেলি?

এক বন্ধুর কাছে। সারাদিন আমরা এখানে থাকব সালমা।

ঠিক। জানিস রকিব, মনে মনে আমি এমন একটি জায়গাই খোঁজ করছিলাম। যেখানে পাথরের গা বেয়ে ঝরনা বয়ে যায়। হরিণ আসে দৌড়ে। শকুন্তলার সেই আশ্রমের মতো। এখানে তো সেসব কিছু নেই। কেবল আম-কাঁঠালের বন।

না থাক। আমি মনে মনে সব খুঁজে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি ধুলা-ওড়া রাস্তার দুপাশে ইউক্যালিপটাসের সারি। লম্বা লম্বা গাছের মাথায় বাবুই পাখির বাসার মতো ঝোপ। সেদিকে তাকালে মনে হয় আমি কী যেন ফিরে পেয়েছি। আমার আর কিছু চাই না।

তুই একটা বোকা মেয়ে সালমা। চল, ওই পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

রকিব সালমার হাত ধরে হাঁটে। এমন নির্জন সঙ্গ ওর জীবনে আর কোনোদিন আসেনি। সালমাকে এত কাছের মনে হয়নি কখনো। এত প্রাণখোলাও না। ওকে আজ অন্যরকম লাগছে। গজিয়ে ওঠা কচুপাতার মতো সতেজ আর পেলব। মোহনীয় বটে। আদতে সালমা একটা দুঃখী মেয়ে। সুখ ও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে ফেলে। আর অনবরত হারায় বলে কোথাও সালমার স্বস্তি নেই।

জল টলটল পুকুরের চেহারা। লালপদ্ম ভাসছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি দিয়ে নামে ওরা। নামে... নামে... নামে। বেশ অনেকগুলো সিঁড়ি। নিচে জল। সালমা স্যান্ডেল খুলে পা ডুবিয়ে বসে। পানিতে ডুবে থাকা সিঁড়ির গায়ে শেওলার আস্তর পড়েছে। পায়ের তলা পিছল লাগে।

সঙ্গে কাপড় থাকলে গোসল করতাম।

কাপড় জোগাড় করা যাবে।

কোথা থেকে?

ওই দেখ না দারোয়ানের বাসা। ওর বউয়ের একটা শাড়ি নিয়ে আসব।

না বাবা, দরকার নেই। ওই তেল চিটচিটে ময়লা শাড়ি আমি পরতে পারব না।

তাহলে আর কি?

রকিব হাত উল্টে মুখভঙ্গি করে। তুই বোস। দারোয়ানকে কিছু খাবার ব্যবস্থা করতে বলি। রকিব লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ডিঙিয়ে চলে যায়। সালমা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে। রকিব অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় ও বুঝি কোনো এক পাতালে নেমেছে। ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলো শেষ হয় না। নিচের দিকে। নামতে নামতে সিঁড়ি যেখানে শেষ হয় সেখানে জল টলটল করে। একটু দূরে লাল পদ্ম। হাত বাড়িয়ে তুলে আনতে হয়। সালমার নসিয়ার মতো লাগে। চিৎকার করে ওঠে, রকিব আমি নামতে চাই না। উঠতে চাই। উঠতে চাই।

কিন্তু কেউ কোথাও নেই। সালমার ক্ষীণ কন্ঠ বাতাসে এপাশ-ওপাশ দোলে। দারোয়ানের হাঁসগুলো জলে ভাসে। সালমা কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়। পারে না। সিঁড়ির পাশের দেয়ালের সঙ্গে মাথা হেলিয়ে দেয়। সাদা হাঁসগুলো পরি হয়ে এসে সালমার হাত ধরে। সালমা যেন পাতালপুরীর রাজকন্যে। ওরা ওর চারদিকে পাখা ছড়িয়ে নাচছে।

কিরে, তোর মুখটা এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?

রকিবকে সামনে পেয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সালমা।

রকিব, আমি নামতে চাই না।

ভয় কি, আমি তো আছি।

রকিব ওর গালে চুমু দেয়। কেউ টের পায় না। আম-কাঁঠালের ছায়ায় দুজনে ঘুরে বেড়ায়। এত কথা যে ওদের জমা ছিল তা ওরা জানত না। কখনো লুকোচুরি খেলে, কখনো অকারণ দৌড়াদৌড়ি করে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুমু খেয়ে সালমা আবার

নিজেকে ফিরে পায়। ফিরে পায় সুখের লোমশ শরীর। ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে পাখিগুলো কিচকিচ করে। দূরের মাঠে হরিয়ালের ঝাঁক এসে বসে। শুকনো পাতা খয়েরি। পাকা পাতা হলুদ। সজীব পাতাগুলো সবুজ। নিজেকে অমন পাতার মতো মনে হয় সালমার। জীবনটা এমনি। সবুজ, হলুদ আর খয়েরি। এর বাইরে আর সব রং বুঝি বেমানান। সবুজ থেকে হলুদ হয়। হলুদ থেকে খয়েরি। হঠাৎ করে দৃষ্টি আটকে যায় একটা পাখির গায়ে।

ওটা কী পাখি দেখ তো রকিব? নীলের ওপর সাদা বড় বড় ফোঁটা। ঠোঁটটা কত বড় দেখ? আমার দিকে কেমন করে যেন তাকিয়ে আছে।

পাখিটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না। তবে শুনেছি, ওটা নাকি যেখানে ডাকে সেখানে কেউ না কেউ মারা যায়।

যাহ্! বাজে কথা।

হ্যাঁ, সত্যি। লোকে বলে।

সালমার গাটা শিরশির করে ওঠে ওই পাখিটা যদি এখন ডেকে ওঠে তাহলে কে মরবে, ও, না রকিৰ আশপাশে তো আর কেউ নেই। সমস্ত পরিবেশ সালমার সামনে প্রথমে হলুদ তারপর খয়েরি হয়ে যায়। মৃত্যুর রং খয়েরি। পায়ের তলে পড়া শুকনো পাতার মতো মৃত্যুর পর মচমচিয়ে ভেঙে যায় শরীর। আর কিছু বাকি থাকে না। মিশে যায় মাটিতে। কেমন যেন লাগে সালমার। আবার সেই নসিয়া। মাথা ঘুরে ওঠে।

ওই পাখিটা যদি এখন ডাকে রকিব।

কী হবে, হয়তো আমি মরে যাব।

তুই কেন? আমি মরব।

কাউকে মরতে হবে না। ওই দেখ পাখিটা উড়ে চলে যাচ্ছে।

কোনদিকে যাবে?

কী জানি। চল, দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। দুজনে আবার হাঁটতে থাকে। কাঁঠাল-আমের ছায়া নরম মিনতিতে পায়ের কাছে লুটোপুটি খায়। কোথাও সবুজ ঘাস। কোথাও লাল মাটি। দূরে চষা ক্ষেত। কোনো গাছ নেই। কেবল মাটির ঢেলা ওলটপালট হয়ে আছে। সালমার বুকটা কেমন করে। মাঠপারের অসীম শূন্যতা পেয়ে বসে। ডাকবাংলার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ে দারোয়ানের বউ নিজের ঘরের দরজার সামনে কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে উৎসুক দৃষ্টি। মুখে বয়সের ছাপ জোয়ারের জলের মতো বিছিয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়ে নেই। হয়নি। ওদের দেখে বউটি আড়ালে চলে যায়। সালমার মনে হয় একবার গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করে আসা উচিত ছিল। এমন নিঃসঙ্গে কেমন করে ওর দিন কাটে? নাকি ও গ্রামের ছোট্ট মেয়ের মতো এখনো আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায়? প্রজাপতি ফড়িং জোনাকি ধরে? পুকুরের জলে সাঁতার কেটে পদ্ম তোলে? ওর অখণ্ড অবসর ও কেমন করে ভরিয়ে তোলে? সালমার খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ওরা ফিরে আসার একটু পরেই দারোয়ান খাবার দিয়ে যায়। আলাদা স্বাদের রান্না। মৌরির মতো লাগে ওর। আলগা সুগন্ধি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে সমস্ত খাবারে। অনেক যত্নে তৈরি। বউটির নির্জন দ্বীপে সালমা এক নতুন অতিথি। ভাবতে গিয়ে পুলক অনুভব করে। রকিব কোথায় হারিয়ে যায়। অন্তর হাতড়ে রকিবকে খুঁজে পায় না সালমা। কেবল অনুভব করে কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরা কেউ যেন দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে জোয়ারের জলের রেখা।

তুই খাচ্ছিস না কেন সালমা?

খাচ্ছি তো।

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, ওকে খাওয়া বলে না।

বেশি দেখলে আমি কী করব।

সালমা উঠে পড়ে। খুব বেশি ও কোনোকালে খেতে পারে না।

জানিস সালমা, মনে হচ্ছে অনেকদিন পর একটা কিছু খাচ্ছি।

সত্যি? আমারও তাই মনে হয়েছে।

সালমা খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে। বালিশ টেনে নেয় কোলের ওপর। বাইরে আম-কাঁঠালের মাথার ওপর নির্জন দুপুর আঁকিয়ে বসেছে। জানালা দিয়ে দূরের আকাশে দৃষ্টি ফেললে দু-একটা ভুবন চিল উড়তে দেখা যায়। সালমার শরীর ঝিম ধরে আসে। অলস ঝিমুনিতে পেয়ে বসে। রকিব তখনো খেয়ে চলে।

সব শেষ না করে উঠবি না দেখছি?

আঃ, কথা বলিস না।

রকিব তৃপ্তির ভেঁকুর তোলে।

ঠিক আছে, ততক্ষণে আমি ঘুমিয়ে নিই।

সালমা টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে। রকিব আড়চোখে ওকে দেখে। সালমা নির্বিকার। চোখ বুজে আছে। বাইরে শিরীষ গাছের মাথায় বসে একটা যমকুলি মিষ্টি স্বরে ডেকে যায়। টকটকে লাল ডানা আর চকচকে পালকে মোড়ানো সুন্দর পাখি। নির্জন দুপুরে মিষ্টি গানে তন্দ্রার মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সালমা। মনে হয়, অনেককাল আগে কোথায় যেন ও একটা স্বচ্ছ জল টলটল সরোবর ফেলে এসেছে। সাদা-বুক মাছরাঙা সেই সরোবরে ডোবে আর ওঠে। সে পুলকের যেন শেষ নেই। সালমার মনে হয় সে-রকম একটা পুলক ওর ঘাড়ের কাছে থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। আবার পায়ের তলা থেকে উঠে আসছে। আবার নামছে। আবার উঠছে। মনে হয় সাদা-বুক মাছরাঙা যেমন অনবরত

ডোবে আর ওঠে ঠিক তেমনি একটা খেলা জমে উঠেছে। সালমার ভালোই লাগে। আরামে চোখ বোজে।

তবু স্বস্তি নেই। নাকের কাছে লাল পদ্মর ঘ্রাণ পায়। টকটকে লাল পদ্ম টলটলে জলে ভাসে। সালমার ডুবে যেতে ইচ্ছে করে সেই অতলে। আজ কেমন যেন লাগছে। একদম গা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। সব ইচ্ছেগুলো আম-কাঁঠালের বনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে পাখি হয়ে চলে যেতে বাসনা হয়। অন্য কোথাও। অনেক দূরে। সেই রকম একটা নির্জন দ্বীপ বুকের ভেতর জেগে ওঠে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেউ আর কোথাও নেই। কে যেন সলিমার সব অনুভূতি অবশ করে ফেলেছে। কই, কাউকে তো ডাকেনি ও! কে এলো চুপিসারে! ঘুম ঘুম লাগে। ঘুম আসে না। অথচ নিবেদনে মন চায়।

কানের কাছে অস্পষ্ট, ডাক শোনে সালমা। নির্জন দ্বীপে ও মাত্র একজন লোক খুঁজে পেয়েছে।

সালমা।

কথা বলিস না।

সালমা।

আঃ, কথা বলতে চাই না।

এখন কী করব সালমা?

সিঁড়ি দিয়ে তো নামছি।

তারপর?

সামনে জল টলটলে পুকুরে লাল পদ্ম ভাসে।

তারপর?

আমরা পদ্ম ছিঁড়তে জলে নামব।

আমরা পদ্ম বুকে নিয়ে জলে ভাসব।

আমরা পাতালপুরীতে চলে যাব। আবার সব এলোমেলো হয়ে যায় সালমার। সাদা মসৃণ মাখনের মতো ফিকে হলুদ গায়ের রঙের ওপর প্রজাপতি দেখতে পায়। প্রজাপতি ওড়ে সালমার শরীরে। সালমার মনে হয় অনেকদিন আগে ওর ঘরে রোজ প্রজাপতি আসত। এক-একদিন এক-একটা। কখনো সাদা দেয়ালে পেইন্টিংয়ের মতো বসে থাকত। পল গঁগার ছবি যেন। কখনো স্বচ্ছন্দে উড়ে বেড়াত। একটুও ভয় পেত না। সালমা কোনোদিন ওগুলো ধরার চেষ্টা করেনি। কেবল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। আজ প্রজাপতি খুব কাছে। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। ধরতে ইচ্ছে করে। ধরে বুকের আঁচায় ভরে রাখব নিশ্চিন্তে।

সালমার মনে হয় ও অনেকদূর পথ চলে এসেছে। অনেক রাস্তা পেছনে ফেলে ও তরতরিয়ে চলে এসেছে। একটুও কষ্ট হয়নি। বেদনা না, দুঃখ না, বিষণ্ণতা না, কেবল সুখের মতো ধানের শীষ সালমার বুকের মাঠে মাথা উঁচিয়ে আছে। আর কোথাও কিছু নেই। লোকালয় ছেড়ে চলে এসেছে বাইরে। সব পেছনে ফেলে। সব ছেড়েছুঁড়ে। তখনই মনে হয়, নগ্ন হয়ে গেছে ও। নগ্নতার লজ্জা পেয়ে বসে ওকে। আবিরের মতো রং ছড়াতে ছড়াতে চলে যায় ও। তখন কিছু মনে থাকে না। ভেসে আসে পাখির মিষ্টি গান আর তখনই ঘুম পায় সালমার। ঘুম। ঘুম। হরিয়ালের ঝাঁকের মতো ঘুম এসে নামে দুচোখে।

শেষ বিকেলে রকিবের বুকে মুখ গুজে থাকা মাথাটা টেনে উঠিয়ে লাল হয়ে যায় সালমা। মিটমিটিয়ে হাসে রকিব। ওর ঘুম অনেক আগে ভেঙেছে। চুপচাপ শুয়ে ছিল। রকিবের মুখে হাসি দেখে সালমা মাথাটা বালিশে গুজে দেয় আবার।

তোর হাসি দেখলে গা জ্বলে।

রকিব হো হো করে হাসে।

উঃ, থামবি!

না, থামব না।

বেশ তাহলে আমি চলে যাই।

সালমা উঠে বসে। রকিব ওকে বুকের ওপর টেনে নেয়।

যেতে চাইলেই কি হয়?

সালমা কথা বলে না।

অ্যাই সালমা—

কী?

আবাল খেলা—

যা!

সালমা উঠে বাথরুমে যায়। হাত-মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে নেয়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আবার দেখতে পায় সেই বউটি। পরনে জংলি ছাপা শাড়ি। চোখে ঔৎসুক্য। বুকের মাঝে একটা লাল মোরগ। ওকে দেখে চট করে ঘরে ঢুকে যায়। সালমা যাবে কি যাবে না ভেবে পায় না।

দারোয়ান চা নিয়ে আসে।

তোমার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করা হলো না হামিদ?

কী আলাপ করবেন আপা, ও তো বোবা!

বোবা?

সালমার কণ্ঠে বিস্ময় উপচে পড়ে। অবাক হয়ে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, ওর বুকে সাগর আছে। সেই সাগরের তল নেই। অথচ সে ঠিকানা সালমার জানতে হবে। দারোয়ান দুটো চেয়ার বারান্দায় টেনে এনে দেয়। টেবিলে চায়ের ট্রে রাখে।

তুমি বোবা মেয়ে বিয়ে করলে কেন হামিদ?

মধ্যবয়সী দারোয়ানের মুখে হাসি। অপাঙ্গে চুলকানো সে হাসি নিয়ে নিজের ঘরের দিকে তাকায়।

বড় ভালো মেয়ে ও। ছোটবেলা থেকেই বাপ-মা কেউ নেই। চাচার কাছে ছিল। আমিও ওই বাড়িতে কাজ করতাম। চাচার বাড়িতে সুখ ছিল না ওর জন্য। ছিল কষ্ট। মুখ বুজে সব সইত। একদিন আমাকে ধরে অনেক কাঁদল। কিছু তো বলতে পারে না, কেবল কাঁদে। আমি বুঝলাম সবই। তারপর আমি ওকে বিয়ে করলাম। তখন ওর চাচা আমাকে এই চাকরিটা জোগাড় করে দিলো।

কথা যে বলতে পারে না, তোমার খারাপ লাগে না?

না। কথা দিয়ে কী হবে আপা। আমরা তো সুখেই আছি। এই আপনাদের মতো অনেকে আসে, তাদের সঙ্গে কথা বলি।

সালমা চুপচাপ শোনে। বউটিকে আবার দরজায় দেখা যায়। দারোয়ান উঠে চলে যায়। ইশারায় ওদের কী কথা হয়েছে কে বুঝবে। সালমারও যেতে ইচ্ছে করে। পারে না। কী বলবে ওখানে গিয়ে! দারোয়ানের কথার দরকার হয় না। ও চোখে চোখে কথা বলে।

ভালোবাসা বুঝি এমনি? ভালোবাসতে পারলে শুধু অনুভবে বুঝে নেওয়া যায়, শরীরের সব ইন্দ্রিয় কথার কাজ করে। আর কী। আর কী লাগে। ভালোবাসা না থাকলে দরকার

হয় কথার। তখন চমক লাগাতে হয়। কথা তৈরি করে মন ভরাতে হয়। ইত্যাদি। ইত্যাদি। ঘুরেফিরে সেই কথাটা মনে হয় সালমার, কথা দিয়ে কী হবে আপা, আমরা তো সুখেই আছি।

দারোয়ান এক প্লেট আমের আচার নিয়ে আসে।

আমার বউ আপনার জন্য দিলো আপা—

ইস, তোমার বউ খুব কাজের তো–

সালমা আচার উঠিয়ে নেয়। মধ্যবয়সী লোকটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসে। জিভ দিয়ে আমের টুকরো চাটতে চাটতে সালমা দারোয়ানকে দেখে। লোকটা সিঁড়ির ওপর গিয়ে বসেছে। মধ্যবসয়ী লোকটার বুকের সাগর সুখের মুক্তোয় টইটম্বুর। ওরা বেশ ভালোই আছে। সালমার হৃদয় কাঁপে। কেন যে কে জানে! মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। সূর্য ডোবার পথে। বাড়ি ফিরতে হবে। রকিব কি আবার ঘুমিয়ে পড়ল? নাকি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে? ফিরতে হবে ভাবলেই বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। সালমা ওর যৌবনের কতকগুলো মুহূর্ত এখানে ফেলে যাচ্ছে। জীবনের এ লগ্নের এমনতর উপচার আর কোনোদিন দিতে হয়নি। কিন্তু কই, তার জন্য তো ওর কোনো খারাপ লাগছে না। কোথাও কোনো বেদনার রেখা নেই। ওই বোবা বউটির চোখের ভাষার উৎসুক হাসি সালমার যৌবনের রাজসাক্ষী। যমকুলির মিষ্টি গান সানাইয়ের সুরের মতো বেজেছে। সালমার বারবার মনে হয় ও ওর তেইশ বছরের যৌবনের সঙ্গে ওই মধ্যবয়সী লোকটার বয়স যোগ করে নিয়ে যাচ্ছে। এই নির্জন ডাকবাংলাতে ও হয়তো আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। কিন্তু সঙ্গী হিসেবে যা পেল তার কোনো বিনিময় মূল্য নেই।

কথাটা সালমার কানে এলো সন্ধ্যায়

কথাটা সালমার কানে এলো সন্ধ্যায়। সারাদিন রুবা ভাবির বাসায় কাটিয়েছে ও। রুবা ভাবি কিছুতেই ছাড়েনি। কতকিছু বেঁধে খাওয়ায় ওকে। কোলের ছেলেটা বছর

দেড়েকের। আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। রুবা ভাবির চোখে-মুখে চাপা খুশি। ও অবাক হয়। একটুও কি ক্লান্তি নেই রুবা ভাবির? কেমন করে পারে?

কথাটা শুনে তুই রেগে যাবি সালমা, তবু না বলে পারছি না–কথাগুলো বলার সময়ে রুবা ভাবিকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল। সালমা একটু ঈর্ষা নিয়ে দেখছিল আর মুখটা গম্ভীর করে বলেছিল, শূন্যস্থান পূর্ণ করে পারলে না?

রুবা ভাবি হেসে মাথা নেড়েছিল। সালমা অনেকক্ষণ রাগে কথা বলতে পারিনি। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়েছিল। সারা দুপুর দুজন অনেক গল্প করেছিল। কত আবোল-তাবোল কথা। রুবা ভাবি বলেছিল, তোর গায়ে একটা আলগা সুগন্ধি আছে সালমা। তুই কী মাখিস?

কিছু না। তোমার যত পাগলামি।

রুবা ভাবি একটু যেন অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। সালমাকে জড়িয়ে চুমু দিয়েছিল। খুশির উচ্ছ্বাসটা বেশি বলে সালমার রাগও হয়েছিল। কিন্তু তবু রুবা ভাবির ওপর রাগ করতে পারেনি ও। রাগ করে লাভ নেই। রুবা ভাবি এমনই।

সন্ধ্যার সময় বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে খবরটা ওকে দিয়েছিল সাকিব।

জানিস দিদিভাই, বাবা না প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পেয়েছে।

কী কারণে?

ওই যে দর্শনের ওপর লেখা বাবার বইটার জন্য।

তাহলে আর কি, খুশিতে লাফা।

তুই খুশি হোসনি?

খুশি হবার মতো কিছু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

তুই যে কী দিদিভাই?

সালমা ওর সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালে। কাপড় ছাড়ে। বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ চোখ-মুখে পানি দেয়। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। সাকিবার একটুও বুদ্ধি নেই। এত তাড়াতাড়ি কথাগুলো না বললেই পারত। অবশ্য তাও নয়। ভালো মুড়ে থাকলেও ওই কথাগুলো সালমার গায়ে জ্বালা ধরাত। সহ্য হয় না ওর। বাবা তো গুটিপোকার মতো রেশমের সুতো দিয়ে বাস্তবকে আড়াল করে এক স্বপ্নের মায়াপুরীতে বাস করে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন নয় বলেই অযাচিত মূল্য গ্রহণ করতে পারে। এ পদ্ধতিতে যত সহজে নিজেকে ঠকানো যায় তেমনি তত সহজে অন্যকে ধাপ্পাও দিয়ে চলা যায়।

মাথাটা ধরেছে। সালমা বাতি বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। কপালের পাশের শিরা দুটো দপদপ করে। কী যে হয়েছে ওর। বাবা সম্পর্কিত কোনো চিন্তা মনে এলে আর কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বুনো রাগে অন্ধ হয়ে যায়। সালমা অনুভব করে অধিকারের যে সম্পর্কেই থাকুক, বাবার সঙ্গে ওর কোনো সত্যিকারের অন্তরঙ্গতা নেই। দুজনের মেজাজ ও চরিত্রে আকাশ-পাতাল তফাত। বাবা ওকে বলে ভাবপ্রবণ, মর্বিড। সালমার হাসি পায়। শব্দগুলোর সত্যিকার অর্থ বাবা জানে না। জানলে বলত না। বাবা নিজে কি তার অন্তর হাতড়ে কোনোদিন দেখেছে? বাবা অন্ধ। কিছু দেখতে পায় না। বাবা যত ইচ্ছে ওকে ভালোবাসুক তাতে ওর আপত্তি নেই। বাবার ভালোবাসায় ওর কোনো প্রয়োজন আছে কি না তার খোঁজেও বাবার দরকার নেই। অধিকারের জোরে অথবা ভালোবাসার জোরে কর্তৃত্ব খাটাতে এলেই যত আপত্তি সালমার। সালমার ক্ষেত্রে বাবার ভালোবাসার অর্থ ওর। নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। সালমা বিড়বিড় করে, আমার স্বভাবের নিয়মের বাইরে আর কোনো অধিকার স্বীকার করি না। করি না–করি না। চেঁচিয়ে ওঠে ও।

কি হয়েছে লিমা? চিৎকার করছিস কেন?

মা ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালে।

কীরে শরীর খারাপ?

হ্যাঁ। বমি লাগছে।

সালমা উঠে বাথরুমে যায়। বেসিনের ওপর বমি করে। নাড়িভুড়ি সব পাক খেয়ে উঠে আসতে চাইছে। পেট চেপে ধরে ও। টক টক গন্ধে মাথার দপদপানি আরো বেড়ে যায়।

তোর কী হয়েছে লিমা?

বাবা কাছে এসে মাথার ওপর হাত রাখে। পিঠে হাত বুলোয়। সালমা ট্যাপটা জোরে ছাড়ে। চোখ-মুখে পানি দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। সালমা আবার শুয়ে পড়ে।

এক গ্লাস দুধ আর একটা নোভালজিন ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে নিস।

মা বাতি বন্ধ করে চলে যায়। একটু পরে আনুর মা দুধ আর ট্যাবলেট নিয়ে আসে।

আপামণি?

দাও।

সালমা ঢকঢক করে দুধ খায়।

বাবা কী করছে আনুর মা?

টেলিফোন করছেন। আজকে খালি টেলিফোন আসে।

বৈঠকখানায় কে কথা বলে?

কী জানি কত লোকজন এসেছে।

সালমা আবার চুপ করে যায়। হ্যাঁ, লোকজন তো আসবেই। সবাই বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। ঘনঘন টেলিফোন করছে। একদল চিরকাল অন্যের স্তুতি গেয়ে সুখ পায়। নোভালজিনের দরুন মাথাব্যথা কমে যেতে থাকে। একটু একটু ভালো লাগে সালমার। পেছন দিকের বাগানের মাথার ওপর চাঁদ দেখা যাচ্ছে। ঠিক জানালার সোজাসুজি। কখনো মেঘ এসে ঢেকে ফেলে। মেঘ সরে গেলে উজ্জ্বল আলোয় ভরে যায়। সালমা তাকিয়ে থাকে। টেলিফোনের সেই বন্ধুটির কথা মনে হয়। ও আর একদিনও টেলিফোন করেনি। সালমাও নাম্বারটা জানে না। সেই ভরাট কন্ঠস্বর যখন কানে বাজে, মনটা শূন্য হয়ে যায়। অনুভূতি তেতো হয়ে থাকে। বড় জ্বালা। ঘুরেফিরে একটি বোবা বউয়ের কথা মনে হয়। কথা না জানলেও সুখ তৈরি করতে জানে। জংলি ছাপা শাড়ি পরে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। মধ্যবয়সী একটি লোক তার সান্নিধ্যে জীবনের সব ব্যর্থতার কথা ভুলে যায়। ব্যর্থতার গ্লানি ওদের হতাশ করে না। আম-কাঁঠালের নিরিবিলি ছায়া ওদের বিষণ্ন করে না। আহ্, জীবনের কী বিচিত্র অনুভব। চাঁদটা আর দেখা যায় না। একটু করে ঘন কালো মেঘের আড়ালে চাপা পড়েছে। সালমার মনে হয়, অমন একটি কালো পাথর সালমাকেও চাপা দিয়ে রেখেছে। আজ রাতে ওই চাঁদ দেখা যাবে না।

দিদিভাই।

সাকিব এসে বিছানার ওপর বসে।

দিদিভাই ঘুমিয়েছিস?

না।

তবে চুপচাপ কেন?

বেশি কথা ভালো লাগছে না।

বাবা তোকে ডাকছে।

কেন?

জানি না।

সালমা আরো পাঁচ-সাত মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকে। সাকিব উসখুস করে।

যাবি না?

হ্যাঁ। যাচ্ছি চল।

সালমা উঠে বাবার ঘরে আসে। মা নেই। সম্ভবত বসার ঘরে অথবা রান্নাঘরে।

আমাকে ডেকেছ?

তোমার কি শরীর খারাপ?

না, এমনি মাথা ধরেছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

বসো।

ডেকেছ কেন?

বসো না।

সালমা চেয়ার টেনে বসে। কেমন অস্থির লাগছে। গা-টা গুলিয়ে উঠছে বারবার। বাবার ওই আত্মতৃপ্তির হাসি অসহ্য। সারা মুখে কী যেন চকচক করছে।

কাল বিকেলে বাসায় একটা পার্টি দেব ভাবছি।

ভালোই তো।

তুমি আর সাকিব দুজনে বাসায় থাকবে।

আমি থাকতে পারব না। আমার বাইরে কাজ আছে।

এমন কিছু জরুরি কাজ নিশ্চয় নয়?

হ্যাঁ, খুব জরুরি।

কী কাজ বলো?

সব কথা শুনতে চাও কেন?

লিমা!

তোমার জন্য আমার লজ্জা হয়। যা তোমার প্রাপ্য নয় সে সম্মান নিতে তোমার বিবেকে বাধে না?

সালমা দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। নিজের ঘরে ঢুকে ধড়াম করে দরজা বন্ধ করে। জাহিদ চৌধুরী হাঁ হয়ে থাকে। সালমা এমন আচরণ করবে ভাবতেই পারেনি। সাকিবও অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছে।

আমার এত বড় সাফল্যে মেয়েটা খুশিই হয়নি।

দিদিভাই এমনই। ওর কথায় তুমি কিছু ভেবো না বাবা।

তা নয় রে। ওকে ছাড়া আমি অন্য কিছুই ভাবতে পারি না। কী যে হবে ওর। ওর ওপর রাগ করা মানে নিজের ওপর রাগ করা।

জাহিদ চৌধুরী আবার নিজের কাজে ডুবে যায়। সালমার কথা ভেবে মন খারাপ করার সময় তার নেই। তাছাড়া ওর কথার অর্থ ধরার কোনো মানেই হয় না। ও যেসব কথা বলে তার সবটাই পাগলামি। অন্তত জাহিদ চৌধুরী তা মনে করে।

পরদিন বাড়িতে উৎসব। সারা সকাল সাকিব আর ঘর-দুয়ার গোছায়-সাজায়। সালমা চুপচাপ দেখে। মা ওকে কিছু বলেনি। ও নিজে থেকেও কিছু করেনি। সাকিব ওর দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসে। সালমা বাথরুমে ঢুকে শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঝরঝরিয়ে পানি পড়ে। একে একে কাপড় খোলে ও। সাদা পিছল গায়ের ওপর দিয়ে জলের রেখা সরু হয়ে নামে। গুনগুনিয়ে গান গায়। কেন জানি ভীষণ ফুর্তি লাগে। ধেই ধেই করে নাচলেও তার প্রকাশ বুঝি ঠিক হবে না। কণ্ঠে গান উপচিয়ে আসে। একসময় গুনগুনানি বাদ দিয়ে গলা ছেড়ে দেয়। জলের নিচে দাঁড়িয়ে সালমা আনন্দের জোয়ারে ভেসে যায়। কোথা থেকে যেন মুক্তি পেয়েছে ও। জলের স্পর্শে সে মুক্তি বাঁধনহারা হয়। গত রাতে বাবার মুখের ওপর একটা কথা ছুড়ে মেরেছে। জাহিদ চৌধুরী যদি বুদ্ধিমান হয় ওইটুকুতে তার সব বুঝে নেওয়া উচিত। না, বুঝলেও বুঝবে না। এখানেই জ্বালা। নিজের অন্তরে ছায়া দেখতে পায় না জাহিদ চৌধুরী। পেলে কি তার অন্তঃসারশূন্য আমিত্বকে বিপুল কলরোলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত? জলের নিচে দাঁড়িয়ে সালমা আবার বিষণ্ণ হয়। জলের রেখা তেমনি সরু হয়ে নামে। বাবা সোরেন কেয়ারকে গার্ডের মতো হতে পারে না? লোকে তাকে পাগল বলত। তার 'সোরেন' নামটি পাগলের প্রতিশব্দ হয়েছিল অথচ ডেনমার্কের সেই পণ্ডিতের রচনা যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হলো, দেখা গেল সেই নির্জনতাপ্রিয় আধপাগল লোকটি এক মৌলিক দর্শনের স্রষ্টা। সালমা চায় এমন একটি লোক যে আপন সাধনায় নিমগ্ন থেকে এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের জনক হয়ে যাবে। না চাইলেও লোক যার পায়ে ভক্তি, শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় লুটিয়ে পড়বে। সালমার মাথাটা কেমন যেন করে ওঠে।

জাহিদ চৌধুরী তুমি এমনই মহৎ হয়ে যাও–এমনই মহৎ। তুমি চাকরিগত কোন্দল ছাড়। ঈর্ষাবিদ্বেষ ছার্ডৰ ওপরে ওঠার জন্য সব নোংরা পথ আর বেছে নিয়ো না।

তাহলেই আমি তোমার অনুগত বাধ্য হয়ে থাকব। তোমাকে আমি বার হিসেবে দেখতে চাই, যে আমার অন্তরে আলোর দিশা হয়ে জ্বলবে।

জলের নিচে কতক্ষণ ক-ত-ক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সালমা জানে না। আনন্দের শিল্পিত মুহূর্তগুলো ধুয়ে মুছে নিঃশেষ। এখন জেগে থাকে সাদা বিষণ্ণতা। সাদা পিছল গায়ের মতো সে বিষণ্ণতা জলের রেখা হয়ে নামে। একটু বাতাসে জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে ও। শীত শীত লাগে। হাতের তালু কেমন চুপসে গেছে। চামড়া কুঁচকে আসছে। মাথা ভার হয়ে আসছে। সালমার মনে হয় অনন্তকাল ধরে ও জলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে ট্যাপটা বন্ধ করে। ওই জল তার সাদা বিষণ্ণতা ধুয়ে নিতে পারে না। তোয়ালে চেপে ধরে গায়ের ওপর। ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে চুল থেকে। আয়নায় নিজের মুখটা দেখে চমকে ওঠে সালমা। একদম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে। শরীরের শীত শীত ভাব কমে না। সালমার মনে হয় উত্তাপ চাই। ভীষণ উত্তাপ। একদিন রকিব ওকে চমৎকার উত্তাপ দিয়েছিল। সেই নির্জন বাউরা দুপুরের কথা প্রায়ই মনে হয়। কেমন যেন লাগে। আম-কাঁঠালের ছায়ায় হরিয়ালের ঝাঁক দেখতে পায়। মনে হয় নাভির কাছ থেকে লাল পদ্মের ঘাণ উঠে আসছে। অন্তরে আর কোনো আসক্তি নেই। জাহিদ চৌধুরী মরে গেছে। রকিব হারিয়ে গেছে। জাগতিক সুখ-দুঃখ ঘুমপাড়ানিয়া দেশের সাঁতারু মেয়ে হয়ে গেছে। শুধু জলে তার প্রাণ। জলে তার আনন্দ।

আয়নার সামনে অনেকক্ষণ বসে থাকে সালমা। যত করে নিজেকে সাজায়। সাজাতে ভালো লাগে। জানালার পাল্লার ওপর দুটো বুলবুলি খেলা করে। সালমা পাউডারের পাফ গালে বুলোয়। জানালার ধারে আসে। ওর নির্জন পৃথিবীতে অনেক ঘাস গজিয়েছে। গাছগুলো কেমন নিজীব দেখাচ্ছে। আঙুরলতা শুকনো। যেন কোনো বসন্তের প্রতীক্ষায়। সালমা ঘুরেফিরে আবার আয়নার সামনে এসে বসে। নিজের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় ওর কোনো স্মৃতি নেই। ছোটবেলার কোনো পবিত্র স্মৃতি? না নেই। ভাবল থাকলে ভালো হতো। অন্তত মাঝে মাঝে সেইসব স্মৃতির মাঝে বিচরণ করে ও বিশুদ্ধ হয়ে যেত। আহ, স্মৃতি কত আকাঙ্ক্ষিত। ছোটবেলার কোনো কথা ওর তেমন করে মনে পড়ে না। শুয়ে শুয়ে ওই স্মৃতি নিয়ে লোফালুফি করা যায়। অনেক খেলা জমে ওঠে। রুবা ভাবির চমৎকার স্মৃতি আছে। সালমার কাছে যখন সেসব গল্প করে তখন তন্ময় হয়ে যায়। রুবা ভাবির বারো বছর পর্যন্ত একটা মুক্ত জীবন ছিল। গ্রামীণ পরিবেশে অবাধ বিচরণ ছিল। বনবাদাড়, খালবিল,

ধানক্ষেত, নদীর ধার প্রভৃতি নিয়ে। অনেক স্মৃতি রুবা ভাবির মনে। তরতরিয়ে গাছে উঠতে পারত। একবার জাম পাড়তে গিয়ে লাল পিঁপড়ের কবলে পড়েছিল, একবার ভরা বর্ষায় নৌকা করে পিকনিক করতে গিয়ে পানিতে পড়ে গিয়েছিল, গ্রামের একটি ছেলে আত্মহত্যা করে পেয়ারা গাছে ঝুলেছিল–সব মনে আছে রুবা ভাবির। আরো কত অসংখ্য খুঁটিনাটি ব্যাপার আছে। শুনতে ভালোই লাগে। ওর এসব নেই। সালমার মনে হয় জীবনের বিশুদ্ধ ক্ষণ বড় পবিত্র। আর পবিত্র বলেই মানুষ তাকে ভুলতে পারে না। রুবা ভাবি এখনো নাকি স্বপ্ন দেখে সেই ছোটবেলার পরিবেশে। বর্তমান কাল, বর্তমান মানুষ, অথচ পরিবেশ সেই বিশ বছর আগের হারিয়ে যাওয়া স্থান। সেসব স্মৃতি রুবা ভাবির মনে কী সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করেছে! নইলে অবচেতন মনের সেই স্মৃতি স্বপ্ন হয়ে বারবার। ভেসে আসত না।

বাইরে সাকিবের কথা শোনা যায়। বাবার কোনো ছাত্র এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলছে। একদিন একটি ছেলেকে সালমা অপমান করেছিল। সে আর কোনোদিন আসেনি। তার চাকরি হয়েছে কি না কে জানে। সালমা আলমারি খুলে শাড়ি বের করে। ন্যাপথলিনের ঘ্রাণ আসে। এ গন্ধটা ওর ভালো লাগে। আলমারির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। বাইরে হঠাৎ রোদ কমে যায়। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, মেঘ করেছে। মন্দ না। যা গরম! এক পশলা বৃষ্টি এলে ভালোই লাগবে। হাওয়া বইছে জোরে। শাড়িটা পরে নেবার পর সালমার মনে হলো, কোথায় যাবে সেটাই এখনো ঠিক করা হয়নি। কোথায় যাওয়া যায়? এদিকে যা মেঘ করেছে যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। হ্যাঁ ঠিক, টুক করে নাসিমা'পার ওখানে উঠে গেলে মন্দ হবে না। সাকিব একটু পরে বেরিয়ে যাবে মিষ্টির জোগাড় করতে। আর মা বাথরুমে ঢুকলেই হয়। কেউ টের পাবে না যে সালমা কোথায় গেল।

দুপুরের একটু আগে চুপচাপ দোতলায় উঠে আসে সালমা। ওকে দেখে হাসে নাসিমা।

কিরে কী খবর?

তোমার এখানে এলাম একটু শ্বাস ফেলতে।

বস।

নাসিমা ঘর গোছায়। জাপানি কায়দায় ফুল সাজিয়েছে। ক্রুশে বোনা টেবিলক্লথ, একদম নতুন ফ্রিজের ওপর কাচের নীল রঙের ফুলদানিতে তাজা গোলাপি গোলাপ শুধু। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ আসে। ডিভানে হালকা নীল ভেলভেটের চাদর। চারদিকে চমৎকার ছিমছাম ভাব।

কী ব্যাপার, কেউ আসবে নাকি নাসিমা'পা?

না তো!

যা চমৎকার ঘর সাজিয়েছ।

এ আমার নিজের জন্য সালমা। সবাই পরের জন্য সাজায়। নিজের কথা একটুও ভাবে না। আমি করি নিজের জন্য। ঘরটা সাজাবার পর এখন আমার নিজেকে বেশ পবিত্র লাগছে। দেখ না, একটু পর ধূপ জ্বালিয়ে দেব। ধূপের গন্ধ তোর ভালো লাগে না?

হ্যাঁ। ভীষণ।

তুই আজ আমার সঙ্গে থাকবি সালমা।

সাব্বির ভাই কই?

ও চিটাগাং গেছে।

সালমা মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এটাই ও চাচ্ছিল। কিন্তু এত সহজে কি নাসিমা'পার কাছে সবকিছু প্রকাশ করা যায়? সোফার ওপর কাত হয়ে বসে সালমা একটা বিদেশি পত্রিকায় চোখ বুলায়। নাসিমা তখনো ফুল নিয়ে ব্যস্ত। নানা কায়দায় ফুলদানি সাজাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনোটাই তার পছন্দ নয়। সে কারণেই মাঝে মাঝে তার

গানের গুনগুনানি থেমে যায়। বিরক্তি প্রকাশ করে। আবার ফুলপাতা নিয়ে মেতে ওঠে। শিস বাজায়।

আজ নিজের হাতে বেশ কিছু রান্না করেছি সালমা। খেলে তুই অবাক হয়ে যাবি।

বেশ মজা। দিনটা আজ ভালোই কাটবে দেখছি। জানো নাসিমা'পা, তোমার এখানে এলে আমি অন্য জগতের স্বাদ পাই। নিজেকে হালকা মনে হয়। অথচ লোকে তোমাকে কত কথা বলে।

লোকের কথায় আমার কিছু এসে যায় না।

তুমি আজ ইউনিভার্সিটি যাওনি? ক্লাস ছিল না?

নাসিমা ফুলাদনিটা টিপয়ের ওপর রেখে সালমার পাশে এসে বসে।

কদিন থেকে একটা জিনিস নিয়ে আমি খুব ভাবছি সালমা। সাতদিন ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পারিনি। নিজের কাছে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে।

নাসিমার মুখটা চিন্তিত দেখায়।

কী ব্যাপার নাসিমা'পা?

ভাবছি ইউনিভার্সিটির চাকরিটা ছেড়ে দেব।

কেন? কেন?

ইদানীং মনে হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই। নিজেই কিছু জানি না, অন্যকে কী শেখাব।

কী যে বলো নাসিমা'পা। ইউনিভার্সিটিতে টিচার হিসেবে তোমার তো খুব নাম। সবাই তোমার লেকচার পছন্দ করে।

সে তুই বুঝবি না সালমা। ভীষণ গ্লানি আমাকে পেয়ে বসেছে। কাউকে নতুন কিছু শেখাতে পেরেছি বলে মনে হয় না। কদিন থেকে আমি মরমে মরে যাচ্ছি।

সালমা অবাক হয়ে নাসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাসিমা সোফার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। কী ভীষণ আত্মআবিষ্কার! বরাবর ব্রিলিয়ান্ট ক্যালিবারের মেয়ে ছিলেন। বিদেশ থেকে ডিগ্রি করেছেন। কিছু জানেন না বলে প্রকাশ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই। সালমা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ওর উচ্ছাসে নাসিমাপা হয়তো আত্মঅহংকারে মেতে উঠবেন। না, সেটা হয়তো সম্ভব নয়। যে লোভ মোহ অতিক্রম করে সত্যকে চিনতে শেখে সে কী আবার নতুন করে ভুলে পথে পা বাড়ায়? কখনো না। জাহিদ চৌধুরীর মতো লোভী দুর্বলচিত্তের ব্যক্তিরাই মোহের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

নাসিমা চোখ বুজে বসে আছে। পা নাচাচ্ছে। পরনে হালকা ঘিয়ে রঙের শাড়ি। গায়ের রঙের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। সালমা গা ঘেঁষে বসে আছে। সুন্দরের মাঝে নিজেকে পবিত্র করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় নিবেদিত। একটু পরে ঘরে ধূপ জ্বলবে। দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরে আলো জ্বালবে। তারপর হয়তো গান শুনবে অথবা নিজে গিটার বাজাবে। হঠাৎ নিজেকে বড় তুচ্ছ মনে হয় সালমার। মনে হয় অর্থহীন জীবনযাপন করছে ও। এ জীবনের বড় মূল্য নেই।

নাসিমা মাথা ঝাকিয়ে সোজা হয়ে বসে।

যাকগে, এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সাব্বির এলেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব। কী বলিস?

চাকরি ছেড়ে দিয়ে কী করবে?

অন্য কিছু নিশ্চয় করব। এখনো ভেবে ঠিক করিনি।

নাসিমা শোবার ঘরে যায়। ধূপদানিতে ধূপ নিয়ে এসে জ্বালে। পর্দা টেনে জানালাগুলো বন্ধ করে দেয়।

একটা আপন পৃথিবী তৈরি করিনি সালমা?

করেছ।

নাসিমা ফ্রিজ থেকে খাবার বের করে টেবিলে সাজায়। বুড়ি ঝিকে ইচ্ছে করে আজ ছুটি দিয়েছে। বেরি নাকি অনেকদিন মেয়ের বাড়ি যায়নি। অবশ্য অজুহাতের দরকার ছিল না। বুড়ি ছুটি না চাইলেও। নাসিমা আজ তাকে ছুটি দিত। সালমা আড়চোখে তাকায়। টেবিলে অনেক কিছু সাজিয়ে ফেলেছে নাসিমা'পা। এককোণে ফুলদানিও রেখেছে।

আয় সালমা, খেয়ে নিই।

সালমা অবাক হয়।

এত আয়োজন করেছ তোমার একলার জন্য?

তুই তো রয়েছিস। আমি তো হঠাৎ এলাম। নইলে তো তুমি একলা খেতে?

তা খেতাম। ওই যে বললাম, নিজের জন্য আজ সব আয়োজন পূর্ণ করে তুলতে ভালো লাগছে।

সাব্বির ভাই থাকলে বেশি ভালো লাগত।

তা অবশ্য নয়। সেটাও ভিন্ন জগৎ। দুয়ের মধ্যে তফাত অনেক।

দুজনেই খাওয়ায় মনোযোগী হয়। কোনটা রেখে কোনটা খাবে ভেবে পায় না সালমা।

তোমার কে কে আছে নাসিমা'পা?

বাবা-মা, ভাইবোন সব।

তারা খোঁজ-খবর নেয় না?

না। তোমার খারাপ লাগে না?

মাঝে মাঝে লাগে। তবে সেটা সাময়িক? খুব একটা বেদনাদায়ক নয়। আমার এক দাদু আছে। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমি চলে আসার পর আমি তার অসুখের কারণ হই। ভাবতে মজা লাগে যে, নাসিমা একটি অসুখের নাম।

সালমাও হাসে। নাসিমা হাসতে হাসতে বলে, দাদু মরে গেলে কষ্ট পাব। তবে তেমন কিছু নয়। অনেক কষ্ট আছে, যা অনায়াসে খোলা যায়।

নাসিমা ভাত নেড়েচেড়ে উঠে পড়ে। হাত ধুতে বাথরুমে যায়। সালমা অবাক হলো। হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন নাসিমা'পার? দাদুর জন্য মন খারাপ হয়েছে? অনায়াসে কষ্ট ভুলতে গিয়ে কষ্টের ফাদে বন্দি হয়নি তো আবার? কী জানি, কে জানে। কাউকে বোঝা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সালমা ভাবল। নাসিমা শুধু একটি অসুখের নাম নয়। কারো কারো নাসিমা নামে ভীষণ অ্যালার্জি। ও আরো গভীর কিছু ভাবতে চাইল। বাজে কথা, কষ্ট ভুলতে চাইলে অনায়াসে ভোলা যায় না। ওটা আরো গভীর করে গেঁথে যায় মনে।

নাসিমা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ফিরে আসে।

তুমি তো কিছু খেলে না নাসিমা'পা?

আমি এমনই খাই।

তাহলে এত আয়োজন–

আয়োজনটা আনন্দের জন্য। তুই আবার খাওয়া ছেড়ে উঠে যাস না। যেন।

পাগল। কষ্ট ভুলতে গিয়ে আমি খাওয়া ছেড়ে দিই না কিন্তু নাসিমা'পা।

নাসিমা শব্দ করে হাসে। ফ্রিজের ওপরে রাখা কৌটো খুলে মসলা মুখে দেয়।

আমার জীবনটা এমনই, এই মৌরির গন্ধের মতো। বুঝলি সালমা, কেবলই সুগন্ধির পথে পথে আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

কী জানি, অত বুঝি না। তবে সোজা পথ থেকে নেমে যেতে আমার ভালো লাগে।

কেউ কোনো কথা বলে না। নাসিমা চেঞ্জার ছেড়ে ডিভানের ওপর শুয়ে থাকে। লম্বা চুলের গোছা মেঝেতে গিয়ে ঠেকে। সালমা মাছের কাঁটা বেছে ভাত মুখে পপারে। বাড়িতে বাবা ওকে জোর করে খাবার জন্য বকে। আর এখন সালমার কেবলই খেতে ইচ্ছে করছে। মনে হয়, সারারাত ধরে খেলেও বুঝি তৃপ্ত হবে না। ক্লান্তি আসবে না।

বাইরে মেঘ মেঘ দুপুর ঝিমিয়ে আছে। গাছের পাতা থমথমে, পাখির ডাক নেই। ঝড় আসতে পারে। সালমা খেয়েদেয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। বাড়িতে এখন কে কী করছে কে জানে। বাবা হয়তো ফেরেনি, তার জন্য সালমার কোনো চিন্তা নেই। ওই বাড়িতে সারাবছর উৎসব লেগে থাকলেও ওর কিছু এসে যায় না। সালমা এমনি নিস্পৃহ থাকতে পারে। নাসিমা চোখ বুজে আছে। ঘুমিয়েছে কি? চেঞ্জারে হিন্দি গান বাজছে। সালমার মনে হলো একদিন এমন এক দুপুরবেলা নাসিমা বলছিল যে মিউজিকে রং দেখা যায়। সালমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আজকের দিনটা তো সম্পূর্ণ নাসিমার নিজের। নিশ্চয়ই সে মুহূর্তগুলো নাসিমার সামনে অবলীলায় আসবে। সালমা ডিভানের পাশ ঘেঁষে মেঝের কার্পেটের ওপর বসে। নাসিমার চুলে হাত দেয়। মসৃণ তেলতেলে চুলের গোছা রেশমের মতো নরম।

কিছু বলবি নাকি সালমা?

নাসিমা চোখ না খুলেই কথা বলে।

আচ্ছা নাসিমা'পা আজকের দিনটা তো সম্পূর্ণ তোমার, না?

হুঁ। আজ তোমার আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না?

করছে।

কী?

নেশা।

বাহ চমৎকার। মন্দ হবে না।

মোটেই চমৎকার নয়। তার আগে তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

কখনো না।

সালমা একটু চেঁচিয়ে বলে!

তোকে যেতে হবে।

আমি কিছুতেই যাব না। তুমি তাড়িয়ে দিতে চাইলেও আমি যাব। জোর করে থাকব।

বাপস একদম মিলিটারি মেজাজ।

নাসিমা হেসে ফেলে।

ঠিক আছে তুই থাক। কিন্তু সহ্য করতে পারবি তো?

খুব পারব।

নেশা কিন্তু সাংঘাতিক সালমা। জীবনের রং একদম বদলে দেয়।

সেই স্পর্শবোধে জীবনকে আমিও রাঙাতে চাই নাসিমা'পা।

নাসিমা চেঞ্জারটা বন্ধ করে দেয়। সালমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে উপুড় হয়ে শোয়। মাদকদ্রব্যে নয়, শুধু নামেই যেন নাসিমার নেশা পেয়েছে।

জানিস ড্রাগসের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে অনুভব করা যায়। আপার্সের অনুভূতি এক, ডাউনার্সের অনুভূতি অন্য। আর সাইকেডেলিক হলো একদম আলাদা। আপার্স স্নায়ুকে একদম উত্তেজিত করে তোলে। তখন সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। ঘুম আসে না। কথা বলতে ইচ্ছে করে। যাকে বলে বিরামহীন বকবকানি। চিন্তার গতি অসম্ভব বেড়ে যায়। বাস্তব ভিত্তিহীন কাজ এবং কথা সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ডাউনার্স হচ্ছে এর উল্টো। এটা স্নায়ুকে অত্যন্ত দুর্বল, অন্য কথায় নিস্তেজ করে ফেলে। একটা ঢুলুঢুলু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আচ্ছন্ন করে রাখে। অথচ গভীর ঘুমও আসে না। না ঘুম, না জাগরণ অবস্থা আর কি। কোনোকিছু ভাবার ক্ষমতা থাকে না। সারাক্ষণ একটা বিষাদময় ঝিমুনির মধ্য দিয়ে সময় কেটে যায়। স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য হাত-পা ঝিমঝিম করে। মনে হয় শরীরে কোনো শক্তি নেই। হেরোইন, হাশিশ খেলে এমন হয়। সাইকেডেলিক হচ্ছে আপার্স এবং ডাউনার্সের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। উত্তেজনা ও অবসাদ দুটোই থাকে। দুটোর মিশ্রণে অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হয়। এমন এমন সব ঘটনা বা ভাবনা জন্ম নেয়, যা বাস্তবে একদম অসম্ভব। যেমন ধর পুরোপুরি এ অবস্থার মধ্যে মনে হবে চেঞ্জারে তুই যে মিউজিকটা শুনছিস তার একটা রং আছে, যা-ই দেখতে পাচ্ছিস। যেমন বাঁশির শব্দের রং নীল, ড্রামের শব্দের রং লাল, ভায়োলিনের রং ধূসর। এমনও দেখতে পারিস যে তোর সামনে ওই ফুলদানিটা হঠাৎ একটা বিরাট গণ্ডারের মুখ হয়ে গেল। তুই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলি। অথবা হাসতে আরম্ভ করলি কিংবা কান্না। যে-কোনো কিছু তোর মধ্যে হতে পারে। তার কোনো ঠিক নেই। তুই দেখবি,

এই ঘটার আশপাশে কোনো দেয়াল নেই। চারদিকে শুধু আকাশ আর আকাশ। দেখবি রংধনু তোর সামনে একটা রঙিন সাকো হয়ে গেছে। তুই তার ওপর দিয়ে নির্বিবাদে পার হয়ে যাচ্ছিস। দেখবি তুই পানকৌড়ির মতো কেবল জলে অনবরত ডুবছিস আর উঠছিস। অবশ্য এ সবই আমার অভিজ্ঞতা সালমা। তোর অন্যরকম অনুভূতি হতে পারে। তবে জানিস, প্রায় সব ড্রাগসই তেতো।

তবে তোমরা কেমন করে খাও?

নাসিমা হাসে।

এখানেই তো মজা। এজন্যই তো একে বলে মাদকদ্রব্য। আমি বলি মামদো ভূত! একবার পেয়ে বসলে ওইসব তেতো-ফেতে কিছু না। পথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তুর চাইতেও সুস্বাদু মনে হয়। নাসিমা অনেক কথা বলে যায়। সালমার কানে কিছু ঢোকে না। মামদো ভূত শব্দটা মনে মনে আউড়ে যায়। নাসিমা'পা একটা শব্দ বের করেছে। একবারের জন্য হলেও ওই অনুভূতির স্বাদ সালমার চাই।

কিরে কী ভাবছিস?

মামদো ভূত—

নাসিমা শব্দ করে হাসে।

তোর সাব্বির ভাইয়েরও ওই শব্দটা খুব পছন্দ। যখন তখন বলবে, নাসিমা তোমার মামদো ভূতটা আমার ঘাড়ে চাপাও।

নাসিমা'পা আমিও তাই চাই।

পাগল! সহ্য করতে পারবি না।

পারব। তুমি দেখে নিয়ে ঠিক পারব।

সালমা জোর দিয়ে কথা বলে।

বলো, তুমি দেবে?

সালমা নাসিমার গলা জড়িয়ে ধরে।

আচ্ছা, আচ্ছা দেব। বেলা পড়ক। বিকেলের পর, সন্ধ্যার আগে। এই মাঝামাঝি সময়টা আমার খুব পছন্দ।

সালমা পর্দা ফাঁক করে জানালা দিয়ে বাইরের আলো দেখে। বিকেল নিস্তেজ হয়ে এসেছে। নিচতলা থেকে আনন্দমুখর কথাবার্তা ভেসে আসছে। উৎসব জমে উঠেছে। একতলায় এখন অনেকগুলো রঙিন বাতি জ্বলছে। লাল নীল সবুজ হলুদ। সালমার হঠাৎ মনে হয়, সাকিবের গিটারের শব্দ আসছে। কান পেতে শোনে। হ্যাঁ, ঠিকই। কোনো ভুল নেই। অতিথিদের অনুরোধে সাকিব হয়তো গিটার বাজাচ্ছে। সালমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। জানালা বন্ধ করে দিয়ে নাসিমার ডিভানের পাশে এসে দাঁড়ায়।

নাসিমা'পা ওঠো। তোমার প্রিয় সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম সালমা কিছু বুঝতে পারে না। খেতে গিয়ে মুখটা বিকৃত করে মাত্র। তীব্র নসিয়া পেয়ে বসে ওকে। দিশেহারার মতো চারদিকে তাকায়। প্রচণ্ড অস্বস্তি বুকের আকাশে মেঘের মতো গুরুগুরু শব্দ করে। নাসিমা খিলখিল করে বলে, বাবা, বলছিলাম না, মামদো ভূত। ঘাড় ধরে যেদিকে ঘোরাবে ঠিক সেদিকে ঘুরতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

নাসিমার এলোমেলো ভঙ্গ কন্ঠ ফ্যাসফ্যাস করে। বিননি খুলে চুলগুলো ছড়িয়ে দেয় পিঠে। শাড়িটা খুলে দলামোচা করে ছুড়ে মারে সোফায়। তারপর টলতে টলতে চলে যায় শোবার ঘরে। সালমা আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না। পেটের ভেতর একটা

দৈত্য যেন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলছে। কিছুতেই তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সালমা অন্ধকার হাতড়ে বাথরুমের দরজা খুলে হড়হড় করে বমি করে। দুপুরে খাওয়া নাসিমার প্রিয় রান্নাগুলো সব উঠে আসে। অবসন্ন দুর্বল লাগে। মুখে হাতে পানি দেয়। শাড়ি ভিজে যায়। খুলে বাথরুমে রাখে। ফিরে এসে ডিভানের ওপর শুয়ে পড়ে। বমি বমি গন্ধ আসে শরীর থেকে। কোনো কিছুই এখন আর ওর খারাপ লাগছে না। অবদমিত ইচ্ছেটা ঘুরেফিরে মনের মধ্যে নড়াচড়া করে। যেটা পারবে বলে দুম্ভ করেছে, সেটা পারেনি। পরাজয়ের গ্লানি মনকে সংকুচিত করে রাখে। উপরন্তু মিউজিকের রংটা দেখা হলো না। কোনো অভিজ্ঞতাও হলো না সালমার। নিজেকে সান্ত্বনা দেয় ও। প্রথম দিন পারেনি বলে দুঃখ কী? আবার চেষ্টা করবে, আবার। মামদো ভূত আর যেই ভূতই হোক বাগে আনতেই হবে সালমার। ইচ্ছের পরাজয় কখনোই হতে দেবে না।

চোখ জড়িয়ে আসে। মনে হয় ওর চারপাশে সাকিব খুব মিষ্টি করে। গিটার বাজাচ্ছে। খুব মোলায়ম আঙলে তার স্পর্শ করছে। নাইটিঙ্গেলের গান যেন। সাকিব তুই কত ভালো–তুই বুঝেছিস এখন আমার ঘুম দরকার। প্রিয় ঘুম। প্রিয়তম ঘুম। সালমার ঠোঁটজোড়া কেঁপে কেঁপে থেমে যায়।

বাইরে রাতের শরীরে যৌবনের ছোঁয়া লাগে।

সকালে অনেক বেলায় সালমার ঘুম ভাঙে

সকালে অনেক বেলায় সালমার ঘুম ভাঙে। বুড়ি ঝি এসে তার নিত্যদিনের কাজে লেগেছে। নাসিমা গোসল সেরেছে। ঘরদুয়োর গোছায়। ফুলদানিতে ফুল বদলিয়ে নতুন ফুল সাজায়। জানালা-দরজা সব খোলা। চোখ ধাঁধানো আলোয় ঝলমল করছে সবকিছু। মৃদু হাওয়ায় পর্দা দোলে। নাসিমা ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

কী, ঘুম ভাঙল মেম সাহেবের?

সালমা লাজুক হাসে, উঠতে ইচ্ছে করে না। আর একটু গড়িয়ে নিতে চায় শরীর। অলস অলস ভাব দেহের জোড়ায় জোড়ায়।

থাক, উঠতে হবে না। ঘুমা।

নাসিমার কথায় আবার শুয়ে পড়ে। এটাই চাচ্ছিল ও। তবু নাসিমার সামনে শুয়ে থাকতে একটু লজ্জা লাগছিল। অনুমতি পাবার পর আর দেরি কী? কিন্তু শুলে কী হবে! ঘুম আর এলো না। বুড়ি ঝি এক কাপ চা দিয়ে গেল। গরম চায়ে অলসভাব কেটে যায়। আর তখুনি বাড়ির কথা মনে হয় সালমার। কাল সারারাতে একবারও মনে হয়নি। কী হচ্ছে সারা বাড়িতে? চিন্তা করতে গিয়েই মজা লাগল। ওরা ভাবুক। ভেবে ভেবে সারা হোক। সালমা চোখ বুজে শুয়ে থাকে। নাসিমা বই নিয়ে বসেছে। বাসন্তী রং শাড়ি পরেছে। হালকা সেন্ট মেখেছে গায়ে। বেশ মিষ্টি গন্ধ আসছে। সালমা ভাবল, নাসিমা'পার চারদিকে রুচির ছড়াছড়ি। তার কোনো কাজই রুচি বা আনন্দের বাইরে নয়। কোনো কাজে জোরজবরদস্তি নেই। শিল্পিত চেতনা পরিবেশিষ্ট বলে নাসিমা'পার হৃদয় সমুদ্রের মতো। ব্যাপ্তি গভীরতার রঙে কোথাও কোনো কমতি নেই। পাশাপাশি সাব্বিরকেও ভেবে দেখল সালমা। সাব্বির ভাইও ভালো। সুন্দর মানুষ। নাসিমা'পাকে অনেক কিছুর বিনিময়ে ভালোবাসে। সবচেয়ে বড় কথা নোংরামির উর্ধ্বে নিজেকে পরিষ্কার রাখতে পারে। সালমার মনে হয় প্রতিটি মানুষের এটাই সবচেয়ে বড় গুণ হওয়া দরকার। সবকিছুর উর্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। নইলে নীচতা এসে ব্যক্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করে। মানসিকতায় ওরা চমৎকার। অথচ দজনে এমন একটা জীবনযাপন করে, যেখানে সমাজের কোনো স্বীকৃতি নেই। তাতে কি ওদের কিছু এসে যায়? ওরা তো আপন বৃন্তে ফুল ফোঁটায়, আনন্দের ফোয়ারা ছোটায়–রঙের আকাশ গড়ে তোলে। আর কী চাই? এমন নিবিড় প্রশান্তি পেলে সালমার হয়তো আর কিছু চাওয়ার থাকত না।

এই সালমা ওঠ? নাশতা খেয়ে নে।

খেলে হয় না, নাসিমা'পা?

সে কী কথা? জলদি উঠে পড়।

খিদে নেই। ওঠার তাগিদ অনুভব করে না সালমা। শুয়ে থাকতেই আরাম। এমন আরাম আর কি আছে? নাসিমা টেবিলে নাশতা খাচ্ছে। সালমা তাকিয়ে দেখে। এই ভোরবেলাতেও নাসিমা লম্বা লম্বা নখে গোলাপি কিউটেকস লাগিয়েছে। নখগুলো প্লেট এবং মুখের মাঝামাঝি ওঠানামা করছে। মন্দ লাগছে না দেখতে।

কিরে, হাঁ করে চেয়ে থাকলেই বুঝি পেট ভরবে?

সালমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাতে পানি দেয়। আয়নায় নিজেকে দেখে। চোখ দুটো ফুলো ফুলো। গাল ফুলো পতলের মতো দেখায় ওকে। গত রাতে খুলে রাখা শাড়িটা পরে। ইস্তিরি নষ্ট হয়ে গেছে। ভঁজ ঠিক নেই। মনটা খুঁতখুঁত করে।

নোংরা শাড়িটা পরলি কেন তুই? আমার একটা পরলে হতো?

থাকগে। একটু পরেই তো নিচে নেমে যাব।

তুই থাক না হয়। আমি পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়তে যাব।

তা যাও। আমিও যাই। দেখি বাসায় কেমন ঝড় বইছে।

বকবে না তোকে?

বকলেই বা। কে গায়ে মাখে!

সালমা বাটি টেনে নিয়ে পুডিং খায়। নাসিমা উঠে পড়ে। ঘরে গিয়ে চুল আঁচড়ায়। শাড়ি পালটায়। তারপর সালমাকে খাবার টেবিলে রেখেই রওনা করে।

তুই খেয়েদেয়ে গান শোন, আমি আসি।

না, অতক্ষণ থাকব না। তুমি ছাড়া এ বাসায় একলা থাকা যায় নাকি?

কী করব বল? ভীষণ জরুরি–

জানি জানি। পড়া ছাড়া তুমি কিছু বোঝে না। যাও, আমি কিছু মনে করব না। খেয়েদেয়ে কাটব।

নাসিমা হেসে বেরিয়ে যায়। এই একটা ব্যাপারে নাসিমা খুব সিরিয়াস। তখন ডানে-বাঁয়ে তাকায় না। বসে বসে এক বাটি পুডিং খেয়ে ফেলে সালমা। নাসিমার অবর্তমানে ঘরটা সৌরভহীন মনে হয়। বুড়ি ঝি ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। সালমার মনে হয় এখানে ওর আর কিছু করার নেই। নিজেকে পরিত্যক্ত কাপড়ের মতো লাগে। মুহূর্তের জন্য এই ঘরকে কেন্দ্র করে গত রাতের স্মৃতি সব ম্লান হয়ে যায়।

সালমা শ্লথ পায়ে বেরিয়ে আসে। বুড়ি ঝি পেছন থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সালমা এক মুহূর্ত তাকায়। বন্ধ দরজার ওপর লাল পর্দা ঝুলছে। টকটকে লাল রং। সালমা মুখ ফিরিয়ে এক পা দু-পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামে। মনে পড়ে একদিন ও এমনই এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিল। সামনে ছিল জল টলটলে পুকুর। পুকুরের লাল পদ্ম। বারান্দার ওপর পা রাখতেই সাকিব চেঁচিয়ে উঠে, দিদিভাই? ছুটে আসে আনুর মা আর জলিল মিয়া। সে চিৎকারে সালমার কোনো ভাবান্তর হয় না। ও ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে এদের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে। ধপ করে বিছানার ওপর বসে বড় একটি নিঃশ্বাস ছাড়ে। সাকিব ওর পিছে পিছে ঘরে ঢোকে। আনুর মা আর জলিল মিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে।

তুই কোথায় ছিলি দিদিভাই? বাবা-মা কাল সারারাত ঘুমোয়নি। ভোরেই দুজনে তোকে খুঁজতে বেরিয়ে গেছে।

কোথায়?

আত্মীয়স্বজনের বাসায়। পরিচিত সব জায়গায়।

ঠিকানা না জেনে ওভাবে খুঁজলে কি আর পাওয়া যায়?

সালমা শব্দ করে হেসে ওঠে। সে হাসি আর থামতে চায় না।

আহ্, দিদিভাই তুই কি পাগল হয়ে যাচ্ছিস? এই দিদিভাই?

সাকিব তুই এখন যা তো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

সালমা বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে যা। আর দরজাটা বন্ধ করে রাখিস।

সাকিব হাত উল্টে মুখভঙ্গি করে। কিছু বোঝার উপায় নেই। সালমার কথামতো ফ্যান ছেড়ে, দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে আসে।

সালমা চোখ বুজে শুয়ে থাকে। কপালের ওপর শিথিল হাত গড়ায়। শাড়ি থেকে কেমন বমি বমি গন্ধ আসছে। গা গুলিয়ে ওঠে, উঠে বাথরুমে যায়। কাপড় ছেড়ে আসে। আলনা থেকে শাড়ি নিয়ে পরে। আবার শুয়ে পড়ে। এখন বেশ লাগছে। মাথাটা হালকা হয়েছে। চোখ বুজলে একজোড়া লাল জুতোর কথা মনে পড়ে সালমার। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বাবা ওকে একজোড়া লাল রঙের উঁচু হিলের স্যান্ডেল কিনে দিয়েছিল। ওই জুতোটা বেশিদিন পরতে পারেনি ও। মাস দেড়েক পরার পর পোলিও হয়েছিল। সেই ভীষণ অসুখটাকে মনে হয় ওর জীবনের একটা গভীর বাঁকবদল। অসুখের পর অনেক দিন লেগেছিল হাঁটা শিখতে। তারপর তো আর ওই জুতো পরার প্রশ্ন ওঠে না। এখনো সালমার কেন জানি ওই জুতোর কথা মনে হয়। অসুখের পর ওই স্যান্ডেল ওর সহ্য হতো না। ভাবতে গেলেই মনে হতো ওর একটা লাল অসুখ হয়েছে।

সালমা শুয়ে শুয়ে বারান্দায় পদশব্দ পেল। উৎকণ্ঠিত পদশব্দ। বোধহয় বাবা-মা।

ফিরেছে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ঘুমিয়েছে। এখন জাগিয়ো না।

সাকিবের কথায় আশ্বস্ত হয় সালমা। যাক, কিছুটা বুদ্ধি রাখে তাহলে। তবু ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। নিঃশব্দে বাবা ঢোকে ঘরে, সালমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখে।

সালমা টের পায় কিন্তু নিঃসাড় পড়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, জাহিদ চৌধুরীর মোটা বুদ্ধি। সাধ্য নেই সালমার অভিনয় ধরার। তেমন সূক্ষ্ম শিল্পিত মন থাকলে ঠিক বুঝত সালমার প্রাণ এখন কোন কাঁটায় ঘুরছে। ভালোবাসা ভালোবাসা বলে বাবা চেঁচায়। কিন্তু ভালোবাসার সেই তীব্র স্পর্শবোধ কই যে, ঘ্রাণেই বুঝে নেবে ওকে?

বাবা যেমনি এসেছিল তেমনি আবার বেরিয়ে যায়। মা বারান্দায় চেয়ারে বসে গজগজ করছে। কত অজস্র কথা বলছে। এই মেয়ে না থাকলে বা কী–

এমন কথাও উচ্চারণ করছে। বাবা কিছু বলছে না। রাত জাগার ক্লান্তি দুজনের চেহারায়। সাকিবও বসে আছে বারান্দায়। ওরা সবাই বসে আছে সালমার অপেক্ষায়। কখন ওর ঘুম ভাঙবে। কখন ও কথা বলবে।

শেষ পর্যন্ত ঘুম আর আসে না সালমার। দুপুর পর্যন্ত মিছেমিছি শুয়ে থাকে। তারপর উঠে গোসল করে। মাথা আঁচড়ায়। লম্বা চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে দেয়। জানে এখুনি ওকে খেতে ডাকবে। একটুক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়ায়। খরগোশের বাক্সটা দেখা যায়। খরগোশ দুটো বাক্সের ভেতরে দৌড়াদৌড়ি করছে। সালমার হাসি পেল। ওরা খেলছে। কী খেলা করছে? ওরা কি আবাল খেলা খেলবে?

আপামণি।

আনুর মা দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়ায়।

আপনাকে খেতে ডাকে। সবাই বসে আছে।

আসছি।

সালমা দ্বিধায় পড়ে। সবাই বসে আছে? বিচারের দণ্ড নিয়ে? কিন্তু ওকে কিছু করার ক্ষমতা ওদের নেই। ওরা তো সালমার মতো মুক্ত মানুষ নয়। ওরা কী দণ্ড দেবে? ওদের মনে হাজারো ছিদ্র। ওই ছিদ্রপথে অনবরত দূষিত বাতাস বয়। ওরা সব দূষিত মানুষ। অপবিত্র। কলঙ্কিত।

সালমা পায়ে কোনো জড়তা না রেখে টেবিলে এসে বসে। মুখটা শিশির ধোয়া ফুলের মতো স্নিগ্ধ। তিনজনে এক পলক চায় ওর দিকে। কেউ কিছু বলে না। বাবা গম্ভীর। মা গম্ভীর। সাকিবের মুখটা ভীতু। সবাই যে যার প্লেটে খাবার তুলে নিচ্ছে। সালমার মজা লাগে। হাসিও পায়। তবু নিজেকে সংযত করে রাখে। ওরা যত বিজ্ঞ বিচারকের ভান করুক, ওদের হাতে বিচারের তুলাদণ্ড নেই। সবাই চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে। মা এটা-ওটা তুলে দেয়। সালমা আজ আর কোনো আপত্তি করে না। একসময় সালমার এই নিপ্রাণ পরিবেশ অসহ্য লাগে। কেউ কথা বলছে না কেন? সাকিবটাও যেন আজ বোবা হয়ে গেছে। ও-ই তো মাতিয়ে রাখে। আজ আবার কী হলো? খাবারগুলো সালমার তেতো লাগে। অর্ধেক খাবার প্লেটে রেখে উঠে পড়ে। বাবা আজ আর ওকে খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করে না। ধমকও দেয় না। নিজের ঘরে আসতে আসতে সালমা শুনতে পায় টেবিল থেকে কথা ভেসে আসছে। স্পষ্ট শুনতে না পেলেন সালমা বুঝল, ওকে নিয়েই আলোচনা করছে ওরা। সামনে কিছু বলছে না কেন? বাবা কি বুঝেছে যে ও আজ তাকে কড়া জবাব দেবে? নাকি বেশি ভালোবাসায় ওকে শক্ত কথা বলতে বাধছে বাবার? সালমা খাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে। একগাদা পত্রিকা জমেছে। একদিনে একটাও দেখা হয়নি। একটু পর মা আসে।

লিমা।

কিছু বলবে মা?

হ্যাঁ, কথা ছিল।

সালমা হাতের পত্রিকা একপাশে রেখে সোজা হয়ে বসে।

বলো, কী বলবে?

তুমি এখন বড় হয়েছ লিমা—

সোজাসুজি বলো না।

বলছিলাম, আমাদের একটা মানসম্মান আছে। বিশেষ করে তোমার বাবার–

মানসম্মান নষ্ট হওয়ার মতো তেমন কিছু করিনি আমি। ভবিষ্যতে কী করি বলা যায় না।

লিমা।

তুমি অযথা কথা বলতে এসেছ মা।

রাগে গরগর করে ওঠে মা। পারলে এখুনি ঝাপিয়ে পড়ে মেয়ের ওপর।

কাল রাতে কোথায় ছিলে?

জেনে তোমার লাভ? চমৎকার একটা জায়গায় ছিলাম। অমন পরিবেশ তোমরা জীবনে তৈরি করতে পারবে না।

সালমার মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব জেগে ওঠে।

আমি ভেবে দেখলাম মা, আমার এই তেইশ বছরের জীবনে তোমরা আমাকে একদিনও আনন্দের মধ্যে রাখখানি।

এসব কী বলছ তুমি? তোমার বাবা তোমার জন্য কী করে? অমন বাবা লাখে একটা মেলে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে সালমা। হাসতে হাসতেই বলে, তুমি জেনে খুশি হবে না মা যে ওই বাবার পরিচয় দিতে আমার রীতিমতো লজ্জা হয়।

মার বড় বড় চোখ দিয়ে আগুন ছোটে। রাগে তোতলাতে থাকে। মুখ দিয়ে ঠিকমতো কথা বের হয় না। সেই সময়টুকুতে সালমা আবার মুখের ওপর পত্রিকা তুলে ধরে।

ধৃষ্টতার একটা সীমা থাকে লিমা। তুমি সেটাও পেরিয়ে গেছ। পড়তে অন্য কোনো বাবার হাতে, ঠিক টাইট থাকতে। লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠিয়ে রেখেছে তোমাকে।

সালমা চুপ করে যায়। আর কথা বলে না। রাগ না, ক্ষোভ না, অভিমান না, কিছুই ওকে ঘায়েল করতে পারে না। মা তার রাগের বদলে এক সবুজ প্রশান্তি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। ওই দুপদাপ করে চলে যাওয়ার ভঙ্গি সালমা অনেক দেখেছে। দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে। মা রাগের সময় কোন পা-টা আগে ফেলে, কোন পা-টা কতটুকু জোরে ফেলে তাও জানে সালমা। মাথাটা কোনদিকে বাঁকিয়ে রাখে সেটাও ওর জানা। সালমা ভাবল, মা এখন বিছানায় উপুড় হয়ে কান্না শুরু করেছে। কেঁদে কেঁদে বাবাকে অনেক কথা বলছে। বাবা চুপচাপ শুনছে। হয়তো পরে একসময় সালমাকে ডাকবে যেসব কথা শুনতে নসিয়ার মতো। লাগে সালমার।

পত্রিকা পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যায় সালমা। আর সে সময়ে সাকিব এসে ঢোকে।

দিদিভাই কী করছিস? পড়ছিস?

সাকিব পাশে বসে। সালমা চোখ ওঠায় না। একটা চমৎকার গল্প পড়ছে ও। গল্পটা শেষ করে আগে। সাকিব দু-একটা পত্রিকা নাড়াচাড়া করে। আবার রাখে। উল্টেপাল্টে দেখে। হাই তোলে। দু-এক কলি গান গেয়ে আবার থেমে যায়।

কীরে অমন ছটফট করছিস কেন?

ধুৎ, কিছু ভালো লাগে না।

কী হলো আবার? একটা কড়া ঘুম লাগিয়ে দে।

ঘুম আসছে না যে।

সাকিব পোষা বেড়ালের মতো তুলতুলে ভাব করে। সালমা মুখটা গম্ভীর করে বলে, হুঁ বুঝেছি, কোথাও গড়বড় বাঁধিয়েছিস নিশ্চয়?

দেখ না দিদিভাই, মিতালি আমাকে কিছু না জানিয়ে চিটাগাং চলে গেছে।

কেন?

সামান্য একটু ঝগড়া।

সালমা হো হো করে হেসে ওঠে।

তুই হাসছিস দিদিভাই?

সাকিবের চোখ ছলছল করে। এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে বুঝি। সালমার হাসি আর থামে না। সাকিব উঠে যেতে চায়। সালমা ওর হাত টেনে। ধরে।

বোস। তুই একটা পাগল।

বাবা-মা তোকে বলে পাগল আর তুই আমাকে বলিস পাগল। বেশ। বেশ।

সাকিব ন্যাকা মেয়েদের মতো মুখটা করুণ করে রাখে।

মিতালি তোর সঙ্গে ঝগড়া করল কেন?

ও করেনি। আমি করেছি।

কেন?

গত রোববার ও আর আমি সোনারগাঁ যাব বলে ঠিক করেছিলাম। শেষে ও আর যেতে রাজি হলো না। আমার রাগ হয়েছিল। আমি ওকে অনেক কড়া কথা বলেছিলাম। তুই বল দিদিভাই, তাই বলে আমাকে না। জানিয়ে চিটাগাং চলে যাবে?

তাই তো, ভারি মুশকিলের কথা। সালমা হাসি লুকিয়ে মাথা চুলকায়।

কবে আসবে মিতালি?

আগামী পরশু।

ইস্, আরো দুটো দিন! তোর জন্য আমার কী যে কষ্ট হচ্ছে সাকিব। তোকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

সালমা নিজের মুখে দুঃখ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। দিদিভাই, ও যদি আর না আসে?

কী হবে? মিতালির মতো কত ভালো মেয়ে আছে। মিতালি গেলে অন্য মিতালি আসবে।

যাহ্, তা কি হয়? মিতালি ছাড়া আমি আর কাউকে ভালোবাসতে পারব না। জানিস দিদিভাই, মিতালি না চমৎকার মেয়ে। ও আমাকে খুব ভালোবাসে।

বলতে বলতে সাকিবের মুখটা দোয়েলের চকচকে ডানার মতো পিছল হয়ে যায়। কিছু লজ্জা, কিছু তৃপ্তির সংমিশ্রণে সাকিবের দৃষ্টি গিটারের ঝংকারের মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। সালমা একটু ভাবে। সাকিব এখনো কত ছেলেমানুষ। ও নিজেকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারে না, নিজেই ধরা পড়ে যায়।

বারান্দায় বাবা-মার পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। পোশাক দেখেই সালমা আঁচ করে যে, ওরা বাইরে যাচ্ছে। বাবা গরদের পাঞ্জাবি পরেছে, মা জামদানি শাড়ি। নিশ্চয়ই কোথাও সভা আছে। তবু নিশ্চিত হবার জন্য সাকিবকে জিজ্ঞেস করে, বাবা-মা কোথায় যাচ্ছে সাকিব?

সেমিনার আছে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে।

উপলক্ষ? রবীন্দ্রজয়ন্তী।

অ।

জানিস দিদিভাই, বাবা না সামনের মাসে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে আমেরিকা যাবে।

তাই নাকি?

আমি বাবাকে একটা ভালো স্প্যানিশ গিটার আর পপ গানের রেকর্ড আনতে বলেছি। তুই কী আনতে বলবি?

কিছু না।

সে সময়ে ফোন বেজে ওঠে। বাবা-মা বেরিয়ে চলে গেছে। সাকিব উঠে যায় টেলিফোন ধরতে। সালমা আবার পত্রিকা হাতে উঠিয়ে নেয়। ভালো লেখা খুঁজতে থাকে। নৃতত্ত্বের ওপর প্রবন্ধ পড়তে ওর ভালো লাগে। মর্গানের বইটা ও খুঁটিয়ে পড়েছে। কিন্তু কোনো ম্যাগাজিনে মনের মতো লেখা পায় না। খোঁজাখুঁজিই সার।

দিদিভাই তোর টেলিফোন।

সাকিব বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে ডাকে। সালমা অবাক হয়। কে আবার এই অসময়ে ওকে স্মরণ করল!

হ্যালো?

হ্যালো সালমা।

জমজমাট দুপুরের মতো ভরাট কন্ঠস্বর। সালমার রক্ত ছলাৎ করে ওঠে। বহুদিন এই কন্ঠ শোনার জন্য ও অপেক্ষা করেছিল।

চিনতে পারছ সালমা?

হুঁ। সালমা লম্বা করে বলে। তুমি আমাকে এ কদিন টেলিফোন করোনি কেন? আমি অনেকদিন ভেবেছি, আজ তোমার টেলিফোন পাব।

সত্যি!

সেই ভরাট কন্ঠের হাসির শিহরণ সালমার কানে এসে আছড়ে পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ যেন। সালমা কান পেতে শোনে। মনে হয় বুঝি ঠিক এমনি স্বরে ইভ নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার মন্ত্র শুনেছিল। এরকম কন্ঠই যে কাউকে যে-কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

হ্যালো সালমা?

বলো।

তুমি একটু থমকে গেলে যেন?

কই, না। তোমার হাসি শুনছি। অদ্ভুত কন্ঠ তোমার।

তাই নাকি? জানো সালমা, তোমার কন্ঠ আমার প্রাণে দখিনা বাতাসের মতো বয়ে যায়। আমি তোমার কন্ঠের রং দেখতে পাই। সাইকেডেলিক কালার।

উহ্, আমারও তাই মনে হয়। মনে হয় তোমার কন্ঠও সাইকেডেলিক কালার।

না তোমার।

না তোমার।

দুজনেই হাসে। সালমার রোমাঞ্চ লাগে। কেমন তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। ওর মনে হয় এ পর্যন্ত কোনো ছেলের জন্য ওর এমন আকর্ষণ হয়নি। এ লোকটা চুম্বকের পাহাড়ের মতো ওকে টানছে। সমুদ্রে ভাসা জাহাজের মতো সালমার অবস্থা। সেই পাহাড়ের টানে সালমা দিকভ্রষ্ট হয়েছে এবং মুহূর্তে সব রাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তার পায়ে চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সাধ হয়। আবার নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন সালমা কেন? ওকে তুমি দেখোনি তাই? দেখলে তোমার সব ইচ্ছে কপূরের মতো উবে যাবে। আমি তো জানি তোমাকে সালমা। কাছে পেলে তুমি আর ফিরে দেখতে চাও না। এই তোমার স্বভাব। যে জিনিস তোমার নাগালের বাইরে তার জন্য তোমার দরদ বেশি।

হ্যালো সালমা?

তোমার সঙ্গে আমার কি একবার দেখা হয় না বন্ধু?

দেখা? কেন তার কি কোনো দরকার আছে? এই তো আমরা ভালো আছি সালমা। পরিচয়ের এ বৃত্তটা বড় বেশি নিঃস্বার্থ বলে অনেক আপন। অনেক ভালো লাগার।

তা হয় না সালমা।

কেন হবে না। একশ বার হয়।

জেদ করে না সালমা।

বেশ তোমার টেলিফোন নাম্বারটা আমাকে দাও। আমার যখন মন চাইবে তখন তোমাকে ফোন করব।

না, সালমা না। সময় বুঝে আমিই তোমাকে করব। তোমাকে নাম্বার দিলে তুমি হয়তো এমন মুহূর্তে টেলিফোন করবে যখন এই আমি, আমি থাকব না। অন্য মানুষ হয়ে যাব। জানো তো বেঁচে থাকার বিশেষ প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আমি হয়ে যায়। আমি তোমাকে আমার এই মুহূর্তগুলো দিতে চাই, যা একান্তই আমার। আর কারো প্রবেশের অনুমতি নেই সেখানে।

তুমি কেবল নিজের দিকের কথাটা বললে।

উচ্ছল হাসি শোনা গেল। সালমা আরো অনেক কথা বলতে চেয়েছিল। বলতে চেয়েছিল এমন সময় তো আমারও থাকতে পারে বন্ধু, যখন সেই সময়ে এই আমি তোমার আমি থাকব না। অন্য কারো প্রবেশ থাকবে আমার অন্তরে। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারল না সালমা। হাসির আড়ালে সব চাপা পড়ে গেল।

সালমা তোমার কন্ঠই আমার কাছে তোমার পরিচয়। এর বেশি আমি কিছু চাই না। আমরা দুজনেই কন্ঠের সাইকেডেলিক কালারে বেঁচে থাকব সালমা।

অপর পাশে টেলিফোন রাখার শব্দ হলো। সালমা রিসিভার হাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

দাঁড়িয়ে রইল দাঁত-ঠোঁট কামড়ে। ভাবল, হয়তো টেলিফোনে কথা। বলাটাই ওর বিলাস। এমনি আরো অনেক বন্ধু আছে ওর। টেলিফোনের। বাইরে সালমার কোনো দরকার নেই তার কাছে। ও মিছেই মাথা কুটে মরছে। সেই চুম্বকের পাহাড়ের কথা মনে

হলো। ও চুম্বকের পাহাড়ের মতো! সমুদ্রের জাহাজগুলো অনবরত দিকভ্রষ্ট করছে। সশব্দে রিসিভারটা রেখে দেয় ও। কান্নার সঙ্গে ভেতর থেকে কী যেন বের করে। দিতে চায়। বাইরে জমজমাট নির্জন দুপুর হা হা করে।

বিকেলে রকিব এলো।

কীরে, তুই নাকি হারিয়ে গিয়েছিলি?

সত্যি সত্যি হারিয়ে গেলে তো বেঁচে যেতাম।

ইস্, দেখি দেখি তোর চোখগুলো অমন ফুলো ফুলো কেন? কেঁদেছিস নাকি?

এসেই জেরা শুরু করলি কেন? বোস না।

তাই তো।

রকিব একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ার টেবিলের সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। সালমা খাটের ওপর উঠে বসে। কখন রকিব এসেছে টের পায়নি। টেনেটুনে শাড়ির কুঁচি ঠিক করে। হাত দিয়ে এলো খোঁপা বাঁধে। সারা দুপুর অকারণ কান্নার পর বুকটা এখন হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে, ডানা মেলে দিব্যি উড়তে পারবে। রকিব ওকে পরখ করছে। মুখে। কিছু বলছে না। কদিনের মধ্যে ও বেশ বড় গোঁফ রেখেছে। ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। একটু রুক্ষও যেন। ওর চোখের দৃষ্টি কাঁপছে। সালমা খাট থেকে নেমে বাথরুমে যায়।

তুই বোস রকিব, আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিই

সেই ভালো। ওই রকম মুখফোলা হুলো বেড়ালের মতো চেহারা দেখে বিকেলটা মাটি করতে চাই না।

সালমা হেসে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে।

হাতে মুখে চোখে জল দিতেই বদলে যায় লুকানো অন্তর। বেসিনের ওপর লাগিয়ে রাখা দেয়াল-আয়নায় নিজেকে অচেনা লাগে সালমার। মনে হয়, এই আমি কোনো আমি নই। ওই রকিব নামক যুবকটিকে আমি চিনি না। আমার শরীরে ওর স্পর্শ নেই। আমার অন্তরে ওর জন্য ভালোবাসা নেই। দূর, ভালোবাসা আবার কী? ভালোবাসা মানে ভিড় জমিয়ে মজা লোটা। চাই না। চাই না। চাই না।

সালমা চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে আবার মুখে হাত চাপা দেয়। জলের স্পর্শ এত মমতাময়ী যে, প্রিয়জনের মতো কানে কানে পথ বাতলে দেয়। জলের ভেতর কী আছে? সালমার ইচ্ছে হচ্ছে শাওয়ার ছেড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে। খোলা ট্যাপ দিয়ে হড়হড় করে জল পড়ছে। বেসিনের ফুটো বন্ধ করে ছোট একটা পুকুরের মতো করে ফেলে তন্ময়। হয়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকে। মনে মনে ভাবে, রকিব আজ না এলেই ভালো করত। এই মুহূর্তে ওকে অসহ্য লাগছে।

কীরে সালমা, বাথরুমে ঘুমিয়ে গেলি নাকি?

রকিব চেঁচিয়ে ডাকে। ও ইচ্ছে করে উত্তর দেয় না। রকিব ডাকুক। ডেকে ডেকে চলে যাক। বউ-কথা-কও পাখির মতো অনন্তকাল ধরে ডেকে ডেকে ফিরুক। সালমা আর কোনোদিন সে ডাকে সাড়া দেবে না।

সালমা, অ্যাই সালমা–

আহ্, তুই আমাকে অমন করে ডাকিস না রকিব। কেউ আমাকে ডাকুক আমি চাই না। বেঁচে থাকার জন্য আমার একটা নিরাপদ পৃথিবী। দরকার। অযথা লোকের ভিড় বাড়িয়ে সে পৃথিবী আমি নোংরা হতে দিতে পারি না রকিব। তুই ফিরে যা। তোর জন্য সালমার কোনো ভালোবাসা নেই।

সালমা কী হলো? কথা বলছিস না কেন?

মিছে ডাকছিস রকিব। তোর এই আবাল খেলার স্বাদ তো তুই আমাকে দিয়েছিস। সত্যি, বড় চমৎকার। কিন্তু এত ক্ষণিকের যে আমি ভুলে যাই সে স্মৃতি। কেন আমার সোনার কৌটায় মানিক হয়ে জ্বলে না রকিব? কেন জোনাকির মতো জ্বলে নিভে যায়?

সালমা লক্ষ্মীসোনা দরজা খোল? আমি বুঝতে পারছি না যে তোর কী হলো?

রকিবের উৎকন্ঠিত কন্ঠে হাসি পায় সালমার। বেসিন ভরে জল উপচিয়ে পড়ছে। ভিজে যাচ্ছে শাড়ি। পায়ের পাতা। এমনি করে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না কেন জলের স্রোত? ভাসতে ভাসতে ও নতুন জাগা দ্বীপে গিয়ে উঠবে। ওখানে দেখবে সব অন্যরকম। মাটি, ঘাস, পাখি, রোদ বর্তমানের চাইতে আলাদা। মাটির রং সাদা ফকফকে, ঘাস হলুদ, রোদ নিবিড় লাল। পাখি একটাও উড়তে জানে না। সে রাজ্য সালমার একলার। বর্ষা বসন্তে হেমন্তে সে দ্বীপের সমস্ত রং যাবে বদলে। এক একটা ঋতু হবে এক একটা রঙের প্রতীক। জলের রং থাকবে সকালে নীলাভ, দুপুরে ধূসর, সন্ধ্যায় বাসন্তি। সমুদ্রের পাড়ে বসে সালমা ঢেউ গুনবে।

সালমা প্লিজ–

রকিবের অস্থির কন্ঠে অঢেল মিনতি। সালমার মন তার কল্পনার দ্বীপের মতো শান্ত হয়ে গেছে। ও খুট করে দরজা খুলে দেয়।

সালমা কী হয়েছে?

রকিব ওর খুব কাছে এসে দাঁড়ায়।

কই, কিছু না তো।

সালমা জল ছড়ায় দুহাতে।

ট্যাপটা বন্ধ করে দে, সব পানি পড়ে যাচ্ছে।

যাক না। জলের সঙ্গে খেলতে ভালোই লাগে।

রকিব একটু অবাক হয়।

সালমা, তোকে আমার চাই একান্ত আপন করে। নিবিড় করে–

রকিব ওকে পাগলের মতো চুমু খায়। রকিবের উচ্ছ্বাসের কবল থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে ও। রকিবের গায়ে যেন অসুরের শক্তি।

ঠাস করে চড় পড়ে রকিবের গালে। অপ্রস্তুত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে যায় রকিবের হাতের বাঁধন। একটু পিছিয়ে আসে। সালমা ট্যাপটা বন্ধ করে দেয়। গোটা শাড়ি ভিজে গেছে ওর। সালমার মনে হয় ওর সারা গায়ে পোকা কিলবিল করছে। এবং ও নিজেই একটা বিরাট পোকা হয়ে গেছে।

ফুল স্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে রকিব ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর প্যান্ট-শার্ট অনেকখানি ভিজে গেছে। সালমার ভিজে শরীরে আশ্চর্য মাদকতা। ভিজে শাড়িতে সপসপ আওয়াজ তুলে সালমা আলনা থেকে একটা শাড়ি নিয়ে যায়। শাড়ি পাল্টে আসার পর ওকে কেমন ফ্যাকাশে দেখায়। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম ঘষে মুখে। মিটিমিটি হাসে।

তোর কি খুব জোরে লেগেছে রকিব?

রকিব কথা বলে না। মুখটা গম্ভীর। সালমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে আছে ও।

অ্যাই রকিব? র-কি-

ছেলেমানুষি দুষ্টুমিতে পেয়ে বসে ওকে। টেনে টেনে উচ্চারণ করে রকিবের নামটা এবং কখনো ভেঙে ভেঙে। তবু সাড়া দেয় না রকিব।

তুই কি আমার সঙ্গে কথা বলবি না রকিব? না বলাই বোধহয় ভালো। কেননা আমার কাছে তোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

কী বললি?

তোকে আমি আর চাই না।

সালমা?

সোজা সরল স্পষ্ট কথা বলছি।

কিন্তু তোকে আমার চাই। আমি তোকে ভালোবাসি।

ভালোবাসা? হেসে গড়িয়ে পড়ে সালমা। তোর ভালোবাসা তো আবাল খেলার জন্য।

সালমা।

সালমা দু'পা এগিয়ে আসে। সালমা হাসতেই থাকে। হাসি আর থামে না। হাসির দমকে ওর শরীর কাঁপে। থিরথির শান্ত জলের বুকে মৃদু স্রোতের মতো।

সত্যি বলছি রকিব, এখনই আসল সময়। আমাদের আর এগোনোর দরকার নেই। এগোতে গেলেই তিক্ততার সৃষ্টি হবে। আমি চাই না তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে।

রকিব সালমার কাঁধ চেপে ধরে। সাঁড়াশির মতো হাত। ঘাড়ে ব্যথা লাগে।

একটু থমকে যায় সালমা। রকিব ওর চোখে চোখ রাখে। ঝুঁকে পড়ে মুখের ওপর।

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি শুধু তোকে চাই। তোর এই নরম মোমের মতো দেহ আমার আবাল খেলার জন্য অবশ্যই দরকার। আমার ভালোবাসা সব মিলিয়ে। বায়বীয় ভালোবাসা আমি বিশ্বাস করি না সালমা।

রকিব সালমার গালে গাল ঘষে। হাত দুটো পিঠের ওপর নেমে আসে। বাঁধন আরো গাঢ় হয়। সালমার অস্তিত্ব নষ্ট করে দিয়ে রকিব সেটা তার আপন দেহে মিশিয়ে নিতে চায়। সালমা এখন অসম্ভব শান্ত। শরীরের ভার ছেড়ে দেয়। রকিব ওকে পাঁজাকোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেয়।

অবিন্যস্ত শাড়ি ঠিক করে। বুকের ওপর আঁচল টেনে দেয়। হঠাৎ করে সালমার ওপর অসম্ভব মায়া হয় ওর। মনে হয় সালমার কেউ নেই। ও ভীষণ একা, ভীষণ নিঃসঙ্গ। এদিকে সালমার ভেতর তখন ফুলে ফুলে ওঠে। চোখের কোণ বেয়ে জলের রেখা নামে।

সালমা তুই কাঁদছিস? তোহাই লাগে কাঁদিস না।

রকিব ওর ভিজে চোখে চুমু খায়। সব শুষে নিতে চায়। এই মুহূর্তে মনে হয় সালমার জন্য ও সব করতে পারে। ও বড় দুঃখী মেয়ে। দুঃখটা ওর নাড়ির পরতে পরতে।

সালমা লক্ষ্মী সোনা বল, তোর জন্য আমি কী করব?

ও কথা বলে না। অস্থির আবেগ রকিবকে কাঁপিয়ে দেয়। সালমার আঁচল দিয়ে চোখ মোছায়। নরম ঠোঁটে হাত রাখে। গালে মৃদু আঙুল ঘষে।

সালমা তোর কী চাই বল? তুই যা বলবি আমি তাই করব। বল সালমা বল।

রকিব ভীষণ কিছু প্রত্যাশা করে। প্রত্যাশা করে নতুন আমন্ত্রণ। সালমার শান্ত মুখে রঙধনু হাসি। মেঘের পরে মেঘ ছাড়িয়ে নীল আকাশে বিহার। সালমা ওকে সঙ্গী করে পথে নামবে। সালমা আস্তে কথা বলে।

রকিব।

বল।

আমি চাই তুই এখন চলে যা।

বেশ।

রকিব উঠে দাঁড়ায়। কোনোদিকে না তাকিয়ে চলে যায়। বাগানের কাঠের গেটটা অসম্ভব শীতল মনে হয়। যে বাড়িটা ও ছেড়ে যাচ্ছে সে বাড়িটাও যে মোমের মতো মেয়েটিকে ও ছেড়ে এলো সে যেন মমি হয়ে যাচ্ছে। এখন আর কোনো আকাশ নেই। জীবন নেই। কোলাহল নেই।

সালমার চোখের কোনায় জলের রেখা দ্রুত গড়ায়। চোখ বুজে শুয়ে থাকে ও। অন্তরে কোনো রকিব নেই। বাইরে সন্ধ্যা গাঢ় হয়। জলিল মিয়া বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। সালমার ঘরে মিটমিটে আলো। সালমার চোখে জল। ঠোঁটে রকিবের স্পর্শ। গালে রকিবের স্পর্শ। বুকের ওপর রকিবের স্পর্শ।

কিন্তু অন্তরে কোনো রকিব নেই।

যখন তখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামে। ইউনিভার্সিটি বন্ধ। সালমার কখনো কখনো একঘেয়ে লাগে। কখনো ভালো। আজকাল ফাঁক পেলেই নাসিমার ওখানে উঠে যায়। ড্রাগস মোটামুটি ধাতে সয়ে গেছে। আর কোনো অসুবিধে হয় না। তবে ওতে সালমা অভ্যস্ত হয়নি। সাব্বির হাসে।

তুমি আমাকে অবাক করেছ সালমা!

কেন?

তুমি যে এত শক্ত মেয়ে, বাইরে থেকে তো বোঝা যায় না।

সালমা শব্দ করে হাসে। নাসিমা ফুল সাজাতে সাজাতে উত্তর দেয়, শক্তর কী দেখলে? ও আরো অনেক কিছু পারবে।

এই তো চাই, কী বলো সালমা? আমার ইচ্ছে করে কী জানো যে শ্লোগান দিই, আসুন আমরা যেমন তেমন করে বাঁচি। ছকবাঁধা জীবন আর কত?

নাসিমা ফ্রিজের ওপর ফ্লাওয়ার ভাস রাখতে রাখতে বলে, তোমার মতো সবার চাওয়াটা এক হলে তো হতোই।

সালমা প্রসঙ্গ পাল্টায়।

ঘরে বসে থেকে তুমি কিন্তু মুটিয়ে যাচ্ছ নাসিমা'পা।

তাই নাকি? তাহলে তো বিশ্রী ব্যাপার। তুমি কী বলল সাব্বির? আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

তরতাজা বিড়ালের মতো।

যাহ্।

যাহ্ নয়। সত্যি কথা।

সাব্বির মুখটা গম্ভীর করে রাখে। সালমার হাসি থামে না। নাসিমা ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করে।

অ্যাই তুমি মুখটা অমন করে রেখেছ কেন?

দেখ নাসিমা, আমি একটা জিনিস ভীষণ ভাবছি।

কী?

উঁহু বলব না।

এই তোমার এক দোষ। কথা শুরু করে আবার থামিয়ে দাও। বেশ, আমিও শুনব না। নাসিমা দুপদাপ শোবার ঘরে চলে যায়। সাব্বির হো হো করে হাসে।

ভাগ্যিস চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। নইলে এখন যদি ওর ছাত্রছাত্রী সামনে থাকত, তাহলে কেমন হলো সালমা?

না সাব্বির ভাই, আপনি নাসিমা'পাকে বড় খেপিয়ে দেন।

এই নিয়ে তো বেঁচে আছি। এক্ষুণি আমি সব ঠিক করে আসছি।

সাব্বির শোবার ঘরে যায়। এ ঘরে বসেই ওদের হুটোপুটির শব্দ পায় সালমা। সঙ্গে উচ্চ হাসি। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে। পারে না। শিরশির করে শরীর। সালমা ভাবল, ওরা কি ভুলে গেছে যে। সালমা এ ঘরে বসে রয়েছে! সালমা বয়স্ক মেয়ে। অথচ ও সীমিত আকাঙ্ক্ষার মেয়ে নয়। রাগ হলো। ভীষণ রাগে হাত কামড়াল খানিকক্ষণ। বাইরে ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। সালমা জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘুরেফিরে ওদের কথা মনে হচ্ছে। ওরা এখন তেপান্তরের মাঠে দামাল যুবক-যুবত। ধুৎ! ভাবনাগুলো তাড়াতে চাইল। বাইরে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির ছোঁয়া নিল। একসময়ে অবাক হয়ে দেখল ওদের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। লাল পর্দাটা শান্ত। সালমা বন্ধ দরজার ওপর দৃষ্টি ফেলে পঁড়িয়ে রইল। ছিটেফোঁটা বৃষ্টি এসে পিঠের। দিক ভিজিয়ে দিচ্ছে। খেয়াল নেই।

ঘরে পানি আসছে আপা!

বুড়ি ঝির খনখনে গা। সালমা ধমকে উঠল ওকে।

তাতে তোমার কী?

সোফা ভিজে গেলে বেগম সাহেব বকবে।

সে আমি বুঝব, তুমি যাও এখান থেকে।

সালমার রূঢ় কণ্ঠে বুড়ি ঝি ফিরে গেল। বুড়ি বিড়বিড়িয়ে কী যেন বলল। হঠাৎ সালমার মনে হলো ওর ওপর ও অকারণে রাগ করেছে। কোনো মানে হয় না এ রাগের। লজ্জা হলো মনে মনে। তবু হাতের পাশে টিপয়ের ওপর রাখা নাসিমার সাজানো ফ্লাওয়ার ভাস এলোমেলো করে ফেলল। লাল গোলাপের পাপড়ি টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিলো বাতাসে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেগুলো গিয়ে পড়ল নিচে ঘাসের ওপর। একে একে তিনটে গোলাপের পাপড়ি ও বাতাসে ওড়াল। জানালায় ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তবু ঘরের দরজা। খুলল না। সালমার অস্থির লাগছে। ইচ্ছে হলো দরজার গায়ে দড়াম দড়াম লাথি মারতে। কিন্তু হাত কামড়ানো ছাড়া সালমা আর কিছু করতে পারল না।

তখুনি ঘরের আরেক পাশে চুপচাপ শুয়ে থাকা টেলিফোনটা শব্দ করে উঠল। সালমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ভীষণ আকাঙক্ষায় দৌড়ে গিয়ে টেলিফোনটা ওঠায়।

হ্যালো?

হ্যালো, সাব্বির খান আছেন?

সরি, রং নাম্বার।

সালমা নিঃশব্দে টেলিফোনটা যথাস্থানে রেখে দিল। যেন ও কোনো মৃত মানুষকে কবরে নামিয়ে রাখল। যেন ও কারো শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইল না। ও ভুলেই গিয়েছিল, এটা ওর বাড়ি নয়। এখানে সাব্বির খান থাকে। কিন্তু ও এখন সাব্বির খানকে ডাকবে কেমন করে? কেমন করে বলবে। টেলিফোনটা আবার বাজল।

হ্যালো, সাব্বির খান আছেন?

সালমা কথা না বলে রেখে দিলো।

টেলিফোন আবার বাজল। 9

দেখুন, আমি ভুল করছি না। এটাই সাব্বিরের নাম্বার। আমি ওর বন্ধু আতোয়ার। ওর সঙ্গে আমার ভীষণ জরুরি দরকার। বিজনেস পারপাস। প্লিজ, আপনি ওকে ডেকে দিন। ওকি বাসায় নেই? হ্যালো হ্যালো হ্যালো–

সালমা টেলিফোন কানে লাগিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কথা বলল। ওপাশ থেকে বিরক্তিসূচক শব্দ পাওয়া গেল। সালমা তব। রিসিভারটা কানে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিড়বিড় করল, বিজনেস পারপাসের চাইতেও ভীষণ জরুরি কাজে এখন সাব্বির খান ব্যস্ত। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওটা আবার বাজল।

হ্যালো? সালমা এবার সাড়া দিলো।

সাব্বির খান কি নেই? রূঢ় কন্ঠ।

আছে।

কোথায়?

লাল পর্দার ওপারে।

লাল পর্দার ওপারে? কী বলছেন আপনি?

ঠিকই বলেছি।

নাসিমা কোথায়?

উনিও ওখানে।

কী করছে ওরা?

এবার সালমার ভীষণ হাসি পেল। কী বোকা লোকটা, কেমন অবলীলায় শুনতে চাইছে।

হ্যালো হাসছেন কেন? অধৈর্য কন্ঠ। বলবেন তো কী করছে ওরা?

সে কথা কি বলা যায়?

লে বাবা, কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা শুনুন, লাল পর্দার ওপারে আর কী আছে? আছে বার্মা টিকের খাট, ফোমের গদি, সার্টিনে মোড়া বালিশ, নাইলন নেটের মশারি—

মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি জানেন না, আজকে কাজ করতে পারলে সাব্বিরের অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে।

কাজ না করলে লোকসান হয়, তা তো জানা কথা।

ধুৎ। আমি আসছি।

ওপাশে টেলিফোন ছেড়ে দেয়। রিসিভার রেখে দিয়ে সালমা চিন্ত য় পড়ে গেল। লোকটা আসছে। কতক্ষণ লাগবে আসতে? দশপনেরো-বিশ মিনিট? না আরো কম? নাকি বেশি? না ভীষণ জরুরি কাজ বলেই লোকটা ছুটতে ছুটতে আসবে। তাঁর আগে চলে যাওয়া ভালো। জানালা দিয়ে বাতাস আসছে। লালপর্দা দুলছে। বুড়ি ঝিকে জানালা বন্ধ করতে বলে সালমা তরতরিয়ে নেমে যায়। আর তখনই ওদের। কাঠের গেটের সামনে এসে থামে একটা ধানি রঙের ড্যাটসান। বারান্দায় সাকিবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সালমার

তোর মুখ-চোখ অমন লাল দেখাচ্ছে কেন দিদিভাই। কী হয়েছে?

সালমা জবাব দিলো না। মনে মনে ভাবল, ভাগ্যিস ওই লোকটা ওকে দেখেনি। তবে সাব্বিরের কাছে গল্প করলে ওরা ঠিকই বুঝতে পারবে যে কার কাণ্ড। সাকিব পিছে পিছে ঘরে ঢোকে।

তুই দোতলায় গিয়েছিলি দিদিভাই?

হ্যাঁ।

বাব্বা, তোর কত সাহস। বাবা জানলে–

জানলে কী হবে? আমি তো সবসময় যাই।

সালমা হাত উল্টে মুখভঙ্গি করে। সাকিব ওকে আর না ঘাঁটিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। জানিস দিদিভাই, মিতালি না ফিরে এসেছে?

খুব ভালো কথা। ঝগড়াঝাটি মিটমাট হয়েছে তো?

হ্যাঁ। সাকিব লাজুক হাসে।

ঝগড়াঝাঁটি বড় বাজে জিনিস, না দিদিভাই?

খুব বাজে। আর কখনো ঝগড়া করিস না।

আমি করি নাকি ও মাঝে মাঝে কেমন যেন করে!

সালমা হাসে।

বাবা-মা কী করছে সাকিব?

বাবা বেরিয়েছে। মা ঘুমুচ্ছে।

বেশ কথা। বৃষ্টি-পড়া দুপুরে ঘুমুতে মন্দ লাগে না।

সামনের সোমবার বাবা আমেরিকা যাচ্ছে।

ও।

প্লেনের টিকিট এসে গেছে।

ও।

বাবার যাওয়াতে আমার খুব খুশি লাগছে। মা-ও খুব খুশি।

হবেই তো। আমেরিকা থেকে বাবা কিছু জিনিসপত্র আনবে। মা এগুলোর জন্য খুশি।

আমার ঘুম পাচ্ছে দিদিভাই। যাই।

সাকিব জানে সালমা হয়তো আর কিছু বলে ফেলবে। এজন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। সাকিবের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সালমা মনে মনে হাসে। সাকিবের সঙ্গে ও আপস করেছে। কেননা সাকিব অনেক কিছুই না জেনে করে। আর ওর এই না জেনে করার ভঙ্গিটা সালমার প্রিয়। এজন্য ও সরল সহজ এবং পরিষ্কার জলের মতো টলটল করে। ওই পানিতে হাত ডোবাতে একটুও অসুবিধা হয় না সালমার।

কিন্তু এখন সালমা কী করবে? ওর তো ঘুম পাচ্ছে না। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছেই। মার ঘরের দরজা বন্ধ। সাকিবও দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সালমা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় এসে বসে। ধানি রঙের ড্যাটসান চলে গেছে। সালমার মনে হয় ও একা এই নির্জন বাড়িটার রাজকন্যে। রাক্ষস এসে মায়ার কাঠি দিয়ে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কেউ কোথাও জেগে নেই। পরিচিত এই বাড়িটা অপরিচিত মনে হয় ওর। গোলকধাধার মতো লাগে। এ বাড়িতে এসে সালমা ওর পথ হারিয়েছে। কামিনী ফুল গাছটার চিকন ডালে একটা লাল-বুক টিয়া বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। হঠাৎ হঠাৎ

অনেক সুন্দর পাখি এ বাগানটায় আসে। একটু ক্ষণের জন্য দেখা দিয়ে কোথায় উড়ে চলে যায়। আর কোনোদিন আসে না। সালমা বারান্দার এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে।

সালমা ভাবল, এ বাড়িতে আরো দুজন লোক থাকে, তারা গেল কই? জলিল মিয়া, আনুর মা বৃষ্টি মাথায় করে বেরোলো নাকি? রান্নাঘরের পাশের ঘরটায় জলিল মিয়া থাকে। আনুর মার জায়গা হয়েছে স্টোররুমে। জলিল মিয়ার ঘরের দিকে এগোলো সালমা। জলিল মিয়াকে ডেকে নিয়ে এসে করতোয়া পাড়ের গল্প শুনবে এখন। ভরা বর্ষায় যৌবনবতী করতোয়া নাকি অনন্যা হয়।

কিন্তু ঘরের কাছে এসে থমকে গেল সালমা। ফিসফিসানি শব্দ ভেসে আসছে গোপনে। তবে কি? সন্দেহটা মনের মধ্যে খেলে গেল। পরক্ষণে হাসল, যদি তাই হয় মন্দ কী? আনুর মা জলিল মিয়া দুজনের বুকেই এখন করতোয়ার উন্মাতাল ঢেউ।

অ্যাই ছাড় না। ছিহ।

কী যে খালি না না করো।

সালমা আর দাঁড়াল না। ফিরে এলো। করতোয়া পাড়ের গল্প শোনা হলো না। সারা বাড়ি একটা নদীর মতো মনে হলো ওর। সেই নদীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সময়ের কাছে নতজানু হয়েছে ওরা। আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। না, এ নিয়ে সালমার মনে কোনো গ্লানি নেই। ও বরং খুশি হলো। ওর মনে হলো সময়ের ঘড়িটা আরো একটু দেরিতে বাজুক। ওরা আরো সময় পাক। সময় পাক নিবিড় হবার–মাতাল হবার–ভোগ করবার। দুজনেই অনেক কষ্টের নদী পেরিয়েছে। অনেক ঘাট গড়িয়েছে। অনেক দীর্ঘ সময় পবিত্র রেখেছে। এখন কি আর সেইসব অপচয়ের দিনগুলোকে সুদে-আসলে ওঠানো যাবে? দরকার কী? যা হারিয়েছে তা হারাক। সামনের দিনগুলো ওদের পায়ে গোলাপ ছড়াক।

সালমা নিজের ঘরে এলো। টেবিলে ওপর রকিবের চিঠিটা এখনো পড়ে আছে। গতকাল ডাকে চিঠিটা এসেছে। আট পৃষ্ঠা চিঠি লিখেছে রকিব। পড়তে পড়তে হাই উঠেছে ওর। বিরক্তি লেগেছে। শেষ করতে পারেনি। ইনিয়ে-বিনিয়ে এত কথা যে মানুষের লেখার থাকে, সালমার জানা ছিল না। সালমা কোনোদিন কাউকে চিঠি লেখেনি। কেমন আছেন, ভালো আছি জাতীয় দুলাইন চিঠিও না। রকিব জানতে চেয়েছে সালমার শেষ কথা কী। সালমার হাসি পেল। কারো জীবনে কোনো শেষ কথা থাকতে পারে নাকি? নতুন নতুন কথা সৃষ্টি করতে না পারলে তো সে জীবন অর্থহীন, ক্লান্তিকর। সালমার জীবনে কোনো শেষ কথা নেই। রকিব একটা পাগল। তাই পাগলের মতো প্রলাপ বকেছে। যতসব ভাবনা। সালমা চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে বাইরে ফেলে দেয়।

সাতদিন পর রকিব এসে হাজির। মুখটা গম্ভীর, রুক্ষ। ওর ভেতরে একটা ভীষণ ওলটপালট চলছে। চুলের ভেতর হাত ডুবিয়ে মাথাটা নিচু করে বসে থাকে। আজ আর ওর ঘরে আসে না। ড্রয়িংরুমে বসে। সালমা অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও রাকব কিছু বলে না।

আমি কি উঠে চলে যাব রকিব? সালমা রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করে।

তুই আমার চিঠি পেয়েছিস?

পেয়েছি।

জবাব দিলি না যে?

তার কি কোনো দরকার আছে?

আমার আছে।

আমি জবাব দিতে বাধ্য নই। তাছাড়া উত্তর দেবার মতো কোনো কথাও আমার নেই।

সালমা?

আমি কোনো কথা রেখেঢেকে বলি না রকিব।

তোর ইচ্ছেটা কী বল তো?

আমার ইচ্ছে? আমার অফুরন্ত ইচ্ছের শেষ আছে নাকি।

সালমা শব্দ করে হাসে। রকিবের মুখটা কালো হয়ে যায়।

তুই ভালোবাসা চাস না সালমা?

কখনো কখনো চাই। সবসময় না। তাছাড়া ভালোবাসার অধিকার আমার সহ্য হয় না। অধিকার যখন জোর করে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন আমার মরতে ইচ্ছে করে।

এর পরিণাম কী?

পরিণাম জানি না।

তোর জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে।

তোর জন্য আমারও রকিব।

তুই আমাকে বুঝতে চাইলি না।

তোকে বুঝি বলেই ফাঁকি দিতে চাই না।

তোর জন্য আমি অপেক্ষা করব।

হেঁদো কথা ছাড়। ন্যাকা পুরুষ আমার পছন্দ না।

সালমা।

রকিবের কণ্ঠে আর্তনাদ বয়ে যায়।

তোর কাছে কি হৃদয়ের কোনো মূল্য নেই সালমা?

আছে। প্রয়োজন হলে তোকে আমি ডাকব।

ডাকিস।

রকিব উঠে দাঁড়াল। বারান্দা দিয়ে হাঁটল। সিঁড়ি দিয়ে নামল। লন পেরোলো। গেট খুলল। চলে গেল।

সালমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল। বুকের মধ্যে কট করে একটা শব্দ হলো। বাম দিকটা ব্যথা করছে যেন। রকিব ওকে ডাকিস বলে চলে গেল কেন? বললেই পারত ও ডাকলেও আর কোনোদিন রকিবের সময় হবে না। ডাক দিলেই কি আসা যায়? বোধহয় আসা যায়। নইলে গালিব অমন কথা লিখবেই বা কেন? গালিবের মতো মহান কবি তো আর মিথ্যে লিখতে পারে না—

অনুকম্পা হলে ডেকে নিও আমায়
যে-কোনো সময়ে;
আমি তো অতীতকাল নই যে
ফিরে আসতেই পারব না।

পেছন ঘুরতেই মার মুখখামুখি হয়ে গেল।

কিরে রকিব অমন করে চলে গেল যে। কী বলেছিস তুই?

বললাম, আর যেন এখানে না আসে।

সালমা হালকা গলায় কথা বলে।

তোর কপালে যে কী আছে? ছোঁউ করে শ্বাস ফেলে। তোর জন্য একটা মজার খাবার তৈরি করেছি। চল।

চলো।

নিজেকে পাখির পালকের মতো হালকা করে দিতে চাইল সালমা। মার পিছু পিছু খাবার ঘরে এলো। আনুর মার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আনুর মার মুখটা যেন ঝলমল করছে। কালো চামড়ার ওপর দিয়ে কী একটা অদৃশ্য ঝলক ভেসে বেড়াচ্ছে।

কী রে হাঁ করে ওকে কী দেখছিস?

সালমা লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আনুর মার স্বাস্থ্যটা একটু ভালো হয়েছে।

আনুর মা টেবিল মুছে চলে গেল। সালমা অনেকক্ষণ ধরে পিঠে খেল। মা তিন-চার রকম পিঠে বানিয়েছে আজ।

তোর বাবা কাল আমেরিকা যাচ্ছে। তুই যাচ্ছিস তো এয়ারপোর্ট?

ক'টায় প্লেন?

সকাল সাড়ে দশটায়।

আমার কাজ আছে। তোমরা যাও।

আমরা তো যাবই। সে কি আর তোকে বলতে হবে?

মা রেগে কথা বলে। সালমা আর কোনো কথা বলার উৎসাহ পায়। কথা বলা বৃথা। পেটপুরে খেয়েদেয়ে উঠে পড়ে। বারান্দা পেরোনোর সময় দেখল, ড্রইংরুমে সাকিব আর মিতালি কথা বলছে। ওদের দেখলে ওর সাদা খরগোশ জোড়ার কথা মনে পড়ে সালমার। ওরা মনের মধ্যে অমনি একটা কাঠের বাক্স বানিয়ে দিন-রাত ওর ভেতর ডুবে থাকে। সারাদিন খেলা করে। কখনো মান-অভিমান, কখনো ঝগড়া। আবার সব ঠিক। একটুও ক্লান্তি নেই ওদের। ওরা নিজেদের মধ্যেই মশগুল। মা পিঠে আর চা পাঠিয়েছে। মিতালিকে বাড়ির সবাই খুব পছন্দ করে। বাবাও কখনো ওকে ডেকে বসায়। বসে কথা বলে। সালমার মনে হয়, ওর অভাবটা কি ওরা মিতালির মধ্যে খুঁজে ফেরে? ও যা দিতে পারেনি মিতালি তা পারে? তাই ওর এত আদর? সত্যি ভালো মেয়ে মিতালি। ওরা কেউ সালমাকে দেখতে পেল না। ও ধীরেসুস্থে বাগানে নেমে এলো।

জলিল মিয়া বেলি ফুলের ঝাড় নিয়ে ব্যস্ত। সারা বাগানে সুন্দর গন্ধ ম ম করছে। গাছভর্তি ফুল ফুটেছে। আজ জলিল মিয়া সালমার দিকে মুখ তুলে চাইল না। করতোয়া পাড়ের ছেলে লাজুক হয়ে গেছে। সালমাও ওর সঙ্গে কথা না বলে বেলি ফুল তুলতে থাকে।

এত ফুল তুলছ কেন আপামণি?

মালা গাঁথব।

কার জন্য?

জলিল মিয়া হেসে ফেলে।

কেন নিজের জন্য? আমার খোঁপায় পরব।

অ। তাই বলো। আমি ভাবলাম আপামণি বুঝি এবার আমাদের মিষ্টিমুখ করাবে।

হুঁ, তুমি আমাকে মিষ্টিমুখ করাও না জলিল ভাই।

আমার কি আর নতুন খবর আছে আপামণি।

আছে আছে। অনেক আছে।

কথাটা বলেই সালমা লজ্জা পেল।

কী যে বলো তুমি।

জলিল মিয়া বেলির ঝাড়ের ওপর নুয়ে পড়ল যেন। সালমা কথা না। বলে ফুলগুলো নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। সারা বিকেল বসে বসে মালা গাঁথল।

রাতে খাবার পর বাবা ডাকল ওকে।

মাসখানেকের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি লিমা!

শুনেছি।

ভালোভাবে থেকো। লেখাপড়া করো মন দিয়ে।

সালমা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

বসো না।

আর কিছু বলবে?

না, ঠিক কিছু বলার নেই। তুমি কাছে থাকলে আমার ভালো লাগে।

বাবা আমতা আমতা করে বলে। যেন খুব সংকোচের সঙ্গে, খুব দীনভাবে কথাগুলো বলছে। সালমার কাছে তার অনেক অপরাধ জমা হয়ে আছে। সেই করুণ চেহারার দিকে তাকিয়ে রাগ হলো সালমার। তবু কন্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করে বলল, আমি যাই।

সালমা বেরিয়ে এলো। বাবা ডাকল না। মা ও সাকিবও কিছু বলল। সালমার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলার মনও ওদের হারিয়ে গেছে। ওকে জোর করে কাছে বসাবার সাহস আর নেই। ওদের নির্বাক পুতুলের মতো বসে থাকার ভঙ্গি অসহ্য। নিজের মেয়ের শ্রদ্ধা যে অর্জন করতে পারেনি সে যাচ্ছে পাণ্ডিত্যের ঝুলি নিয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে।

সালমা ফ্লোরেসেন্ট বাল্বটা নিভিয়ে দিল

ঘরে ফিরে সালমা ফ্লোরেসেন্ট বাল্বটা নিভিয়ে দিল। টেবিল বাতি জ্বালাল। মর্গানের এনসিয়েন্ট সোসাইটি বইটি নিয়ে বসল। নৃতত্ত্ব ওর। পাঠ্য বিষয় নয়। তবু নৃতত্ত্বের বই পড়তে ওর ভালো লাগে। আদিম মানুষের জীবনধারার মধ্যে ও অকৃত্রিম গন্ধ খুঁজে পায়।

সালমার মনে হয় সভ্যতার দ্রুত উত্থানে মানুষ পেয়েছে অনেক, কিন্তু হারিয়েছেও কম না। ওই জীবনেরও একটা বুনো গন্ধ ছিল। পলিনেশিয়ানরা খুব করে সালমার মন টানে। ওই রকম একটা জীবনের স্বাদ ও যদি পেত? সেই বিখ্যাত লাইনটা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে। They know no other God but love. ভালোবাসা ছাড়া ওরা কোনো দেবতাকে চেনে না। এ ভালোবাসা ওদের প্রকৃতির মতো মুক্ত, উদার। সবুজ জীবন আমন্ত্রণ জানায়। কেমন বন্ধনে আবদ্ধ করে। গলা চেপে ধরে না।

পড়তে পড়তে সালমার মাথা নিস্তেজ হয়ে আসে। জানালার বাইরে কী যেন একটা পোকা একটানা ঝিঁঝি করে ডেকে চলেছে। ওর মনে হয় কোনো এক আদিম অরণ্য

থেকে ভেসে আসছে দ্রিম দ্রিম ঢোলের শব্দ। হাঁড়িয়া খাওয়া মাতাল মেয়ে-পুরুষ নাচছে। নাচতে নাচতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে। দুচোখের পাতায় তখন রাতের আকাশের তারার ফুলঝুরি নেমে আসে। গাছের পাতা একটাও নড়ে না। যদি ওদের ঘুম ভেঙে যায়।

সালমা টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্ন দেখে ও যেন এক বিশাল অরণ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পরনে পাখির পালকের রঙিন পোশাক। হাতে তীর-ধনুক। সালমা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পথ আর ফুরোয় না। লতানো গাছ নুয়ে পড়ে গায়ের ওপর। বুনো পাখি ডাকে গাছের আগায়। চারদিকে সূর্য-ঝলমল বনানী। সালমার মনে হয় এমন একটা অপূর্ব পৃথিবীর কামনাই ও করছিল। ও সেই পৃথিবীর একটি মেয়ে হয়ে গেছে। ওর চারপাশে ভালোবাসার দেবতারা গান গাইছে। ঐশ্বর্যময় সেই ভালোবাসায় গা ডুবিয়ে ও হাঁটছে। আর কিছুই বুঝতে পারে না।

সকালে সাকিবের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙে। ও জানালা দিয়ে কথা বলে।

অ্যাই দিদিভাই।

কিছু বলবি?

আমরা এয়ারপোর্ট যাচ্ছি।

ভালো।

বাবা তোকে অবশ্য জাগাতে নিষেধ করেছিল, তবু আমি না জাগিয়ে পারলাম না।

সালমা কথা না বলে পাশ ফিরে শোয়। মনে মনে ভাবল, বেলা তাহলে অনেক হয়েছে। একটু পর বাবা নীল আকাশে উড়াল দেবে। প্লেন থেকে পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ অদ্ভুত দেখায়। পুবের। জানালা দিয়ে একফালি রোদ আসছে। এক টুকরো সোনালি নদী যেন। অসংখ্য ধুলো কণা ভেসে বেড়াচ্ছে সে রোদের গায়ে।

সালমা ভাবল ওই ধুলোকণার সুন্দর বাংলা নাম আছে। ত্রসরেণু। চমৎকার। শুয়ে শুয়ে রোদ আর ধুলোর কণা দেখল ও। আস্তে আস্তে রোদের সোনালি নদী সরে গেল। সালমা উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে নাশতা খেল। আনুর মা রাঁধছে। জলিল মিয়া বাগানে।

সালমা শাড়ি পাল্টে রাস্তায় নামল। অনেক দিন রুবা বাবির বাসায় যাওয়া হয়নি। লেকের পাড় পর্যন্ত ও ধীরেসুস্থে হেঁটে এলো।

তোর কথাই ভাবছিলাম সালমা।

কী ব্যাপার বলো তো? কেমন গোছগাছ চলছে দেখছি।

তোর ভাই সিলেটে বদলি হয়েছে সালমা। সামনের সোমবার। আমরা রওনা করছি।

তাই নাকি? সালমা কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করল।

তোকে আজ সারাদিন আমার সঙ্গে থাকতে হবে সালমা।

না, আজ থাকতে পারব না।

উঁহু, কোনো ওজর-আপত্তি শুনছি না। চলে তো যাচ্ছি। আবার কখন দেখা হবে কে জানে।

দেখা হবারই বা দরকার কী? সারাজীবন ধরে দেখাশোনা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

শোনো মেয়ের কথা। তোর মতো বেশি আমি বুঝি না সালমা। তবে লোকের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে না থাকলে আমার ভালো লাগে না।

তাই থেকো।

সালমার কণ্ঠে উদাসীন নিস্পৃহতা। বেশি কথা বলতে ভালো লাগছে না।

তুই বোস সালমা, আমি তরকারিটা নামিয়ে আসি।

সালমা মোড়া টেনে বারান্দার ওপর বসে। ভাবির বড় মেয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

সিলেটে অনেক কমলালেবুর বাগান আছে না ফুপু?

হুঁ।

অনেক পাহাড় আছে, ঝরনা আছে। উহ্ কী মজা হবে!

তোর বকবকানি একটু থামা তো রেখা।

সালমা ধমক দেয়। রাগ হয়। এবং একসময় কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। রুবা ভাবি হয়তো খোঁজাখুঁজি করবে। তারপর গাল দেবে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সংসারের ঝামেলায় বেরোতে পারবে না এবং সালমার সঙ্গেও তার দেখা হবে না।

রুবা ভাবির ওখান থেকে সালমা সোজা বাসায় চলে আসে। প্রচণ্ড দুপুর গাছের মাথায়। লেকের পানি শান্ত। নির্জন রাস্তায় দু-একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। আবার সব চুপ। আশপাশের বাড়ির দেয়াল উপচে মাধবীলতা, বোগনভিলার লতা ঝুলে আছে। ঘুম ঘুম লাগে সালমার। ছায়াচ্ছন্ন নীরবতা দেখলেই ওর চোখ জুড়িয়ে আসে। বাগানের কাঠের গেট খোলা। গাড়ি বারান্দায় একটা ড্যাটসান দাঁড়িয়ে আছে। সালমা বুঝল সাব্বির ভাইয়ের বন্ধু এসেছে। রিকশার ভাড়া চুকিয়ে ও ঘরে ঢুকল। হাত-মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে এলো। সাকিব আর খেতে বসেছে।

তোর জন্য আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছি দিদিভাই।

মা মুখটা গম্ভীর করেই বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

বাইরে। সালমা প্লেটে ভাত তুলে নেয়।

তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ লিমা। এভাবে ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়।

বড় তো কবেই হয়েছি। সেই দশ বছর আগে।

তুমি জানো তোমার জন্য আমাদের ঘুম নেই। কী তোমার ভবিষ্যৎ, কী তোমার পরিণতি কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।

তুমি এখন ধীরেসুস্থে ভাত খাও তো মা।

সালমা একটুও না রেগে কথা বলে। সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ বেঁধেছে আনুর মা। চমৎকার লাগে। ও জানে এ বাড়িতে ওর প্রিয় খাবারগুলো বেশি রান্না হয়। মার নির্দেশ। মাছের কাঁটা বাছায় বেশি। মনোযোগী হবার দরুন সালমা প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। মার চোখের দিকে তাকায় না। বুঝতে পারে মা একটুক্ষণ খাওয়া বন্ধ করে হয়তো কিছু ভাবছে। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পায় ও। তারপর মার হাত আবার চলতে থাকে। কথা বলে না।

জানিস দিদিভাই, বাবা না যাবার সময়ে বলেছে তোর দিকে বেশি করে খেয়াল রাখতে। তোর জন্য বাবার চোখে পানি ছিল।

তুই থাম তো সাকিব। এসব ও সুঝলে কোনো দুঃখই তো ছিল না।

মা ফোঁস করে ওঠে। সালমা চুপ করেই থাকে। কোনো মন্তব্য করে না। মা ওর প্লেটে আরো দু'টুকরো মাছ উঠিয়ে দেয়। সালমা আপত্তি না জানিয়ে খায়। ও আজ খুব আস্তে আস্তে খায়। মার খাওয়া হলে মা উঠে চলে যায়। সাকিব একটুক্ষণ উসখুস করে আবার বলে, বাবার জন্য তোর মন খারাপ লাগছে না দিদিভাই?

মন খারাপ আবার কিসের?

আমার খুব খারাপ লাগছে। বাবা তোকে যা আদর করে তার এক কণাও যদি আমাকে করত...

সাকিব মুখ নিচু করে। আর কিছু বলতে পারে না। সালমা ভাবল, বাবার কান্নায় সাকিব আজ বিচলিত হয়ে গেছে। বাবা-মার অতিরিক্ত আদর ওকে নষ্ট করছে। ও নিজের করে কিছু ভাবতে পারে না। নরম নরম চেহারা বলে সবাই ভাবে, ও এখনো বুঝি সেই কিশোরই রয়ে গেছে। ওর আচরণের বেশিরভাগটাই কেমন যেন মেয়েলি। ঋজু বলিষ্ঠ দীপ্ত পুরুষের ছায়া খুঁজে ফেরে সালমা। সাকিবের মধ্যে তার এক কণাও নেই। ও হয়তো কোনোদিনই সে ধরনের পুরুষ হবে না, যে পুরুষত্বের দীপ্তি চমকিত না করে, স্থির করে। সেই টেলিফোনের কন্ঠ শুনে সালমা তেমনি পৌরুষের আঁচ পেয়েছিল। কিন্তু সামনাসামনি আর দেখা হলো না। সাকিব মুখ নিচু করেই ফিরনি খেল। সালমার দিকে তাকাল না। সালমাও কিছু না বলে উঠে এলো।

মুখে এলাচ নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল সালমা। শুয়ে শুয়ে একগাদা পত্রিকার ওপর চোখ বুলাল। একটা বই টেনে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ল। কিন্তু খুব মনোযোগ দিতে পারল না। মনটা উড়ু উড় করছে। সেজন্য কোথাও স্থিরচিত্ত হতে ভালো লাগে না। মনটা অন্য কোথাও অন্য কিছু খুঁজে ফেরে। অনেকদিন ধরে সেই প্রজাপতিটা আর আসে না। সাদা ফকফকে দেয়াল নিরাভরণ নারীর মুখের মতো দেখায়। অনেকদিন রকিব আর আসে না। একবার খোঁজও নেয়নি। টেলিফোনও করেনি। জোর করে হাসল সালমা। মাস দুই যাবৎ ও কোনো ড্রাগস খায়নি। নেশা ওকে কাবু করতে পারেনি। সেই মামদো ভূত ও অতিক্রম করতে পেরেছে। সেই টেলিফোনের বন্ধু টেলিফোন করেনি। আর কোনোদিন করবে কি না ও তা জানে না। সবকিছু মিলিয়ে ভাবতে সালমার বেশ মজা লাগল। ক্রমাগত ও সেই নির্জন দ্বীপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর তখনই বুনো আদিম উল্লাস সালমার প্রতি স্নায়ুতে আবাল খেলায় মেতে উঠল।

আপামণি।

কী জলিল ভাই?

দেখবে আস।

কী?

আস না।

সালমা জলিল মিয়ার পিছু পিছু বাড়ির পেছনের বাগানে এলো। অনেকদিন এদিকটায় আসা হয়নি। কেমন একটা সোঁদা গন্ধ সালমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াল। ও চারদিকে তাকাল। হ্যাঁ ঠিকই, ঘাস থেকে আরম্ভ করে গাছের পাতা সবকিছু নতুন নতুন লাগছে। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিল ও। মনে হলো নতুন বাতাস। সতেজ, ফুরফুরে, আনকোরা। জলিল মিয়া খরগোশের বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

এই দেখো।

উফ বাচ্চা হয়েছে? কবে হলো, আমাকে এতদিন বলেনি কেন?

সালমা বাক্সের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ছোট ছোট বাচ্চা দুটো কোলে নিল। কী তুলতুলে শরীর! এত নরম কোনো জীবন্ত জিনিস ও আগে কখনো ছুঁয়ে দেখেনি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে। ওর আর আশ মেটে না।

দেখো জলিল ভাই, কী সুন্দর! কবে হলো?

গতকাল।

আমাকে আগে বলোনি কেন?

তুমি এদিক-ওদিক যাও, এজন্য আর বলা হয়নি।

কিন্তু, কিন্তু জলিল ভাই আমার সুখ কই?

তোমার সুখ আজ সকালে মরে গেছে।

অ।

সালমার মুখ দিয়ে দুঃখ-ধ্বনি বের হয়। ও এতক্ষণে বাক্সটার দিকে ভালো করে তাকায়। মনে হয় বাক্সটার সমস্ত পরিবেশ বদলে গেছে। বাক্সজুড়ে ময়লা-নোংরা। দুধের আর পানির বাটি উল্টে পড়ে আছে। দুঃখ এক কোনায় চুপচাপ বসে ঝিমুচ্ছে। অন্যদিন হলে ও দৌড়ে সালমার কোলে এসে উঠত। আজ কোনোকিছুতেই আগ্রহ নেই। সালমার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখছে না।

বাচ্চা হবার পরই তোমার ওই খরগোশটা কেমন জানি নেতিয়ে পড়েছিল আপামণি। আজ সকালে এসে দেখি মরে পড়ে আছে। আমি দূরে ফেলে দিয়েছি। জানি, ওটা দেখলে তোমার মন আরো খারাপ। হবে।

সালমা একটাও কথা বলতে পারে না। ঘুরেফিরে খরগোশ দুটোর কথাই মনে হয়। অনেক নির্জন সময়ে ওদের খেলা দেখে ওর সময়। কেটেছে। এখন একটা নেই। তার বদলে দুটো বাচ্চা দিয়ে গেছে। সালমা বাচ্চা দুটো বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়।

তোমার চিন্তা নেই আপামণি, ওই পুরুষটার জন্য আর একটা জোড় খুঁজে নিয়ে আসব। সালমা বাক্স বন্ধ করতে গিয়ে জলিল মিয়ার মুখের দিকে তাকাল।

বাচ্চাগুলোর যত্ন নেওয়া দরকার। ওগুলো আবার যেন মরে না যায়।

সালমা উঠে হাঁটতে আরম্ভ করে, কেবলই মনে হয় একটা কথা। ঘূর্ণিতে পড়া পাতার মতো কথাটা মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। সুখ মরে গেছে। আজ সকালে সুখ মরে গেছে। কখনো কখনো কারো কারো সুখ মরে যায়। সুখ পড়ে থাকে মুখ থুবড়ে। সালমা একবার আঙুরলতার পাশে দাঁড়াল। গাছে ছোট ছোট ফল হয়েছে। ছুয়ে দেখল ও। না কোথাও দাঁড়িয়ে স্বস্তি পাচ্ছে না।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো।

নাসিমা ওকে দেখে হাসল, তোর কথাই ভাবছি সালমা।

কী ব্যাপার, সবকিছু নতুন লাগছে নাসিমা'পা?

হ্যাঁ, সবকিছুই নতুন করে ফেলেছি।

নাসিমা মিটমিটি হাসে। রজনীগন্ধার বড় ভঁটার ওপর মুখটা নামিয়ে রাখে। সালমা অবাক হয়। নাসিমা আজ যেন মনপ্রাণ ঢেলে সবকিছু সাজিয়েছে। টেবিলক্লথ, সোফার কভার, পর্দা, ছাইদানি, ফ্লাওয়ার ভাস সবকিছু নতুন। এমনকি ফুল সাজানোটাও। নাসিমা এর আগে কখনো। এমন করে ফুল সাজায়নি।

তুই অবাক হয়েছিস না সালমা?

শুধু কী অবাক? আমি কিছু বুঝতে পারছি না নাসিমা'পা।

আজ আমাদের বিয়ে।

বিয়ে!

সালমা তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে। নাসিমাকে জড়িয়ে ধরে একটা ঘুরপাক খায়।

সাব্বির ভাই কই?

ও বেরিয়েছে কিছু কেনাকাটা করতে।

কখন বিয়ে?

সন্ধ্যায়।

কে কে আসবে?

বেশি কেউ নয়। আমাদের কয়েকজন বন্ধুবান্ধব।

আজ তোমাকে আমি সাজিয়ে দেব নাসিমা'পা?

দিস।

নাসিমা অন্য কাজে মন দেয়। সালমা সোফার ওপর এসে বসে। ওর দৃষ্টি সরে সরে যায়। কখনো ফুলদানিতে, কখনো জানালার পর্দায় অথবা কখনো সোফার পিঠে সুতো দিয়ে ফুটিয়ে তোলা ফুলের ওপর। সালমার কেমন অস্থির লাগে। বারে বারে কর্মরত নাসিমাকেই দেখে। নাসিমার গাল দুটো ডালিমের মতো টকটক করছে। এত রং কোথা থেকে এলো! নাসিমাকে সুখী দেখাচ্ছে।

তোমার এখন কেমন লাগছে নাসিমা'পা?

ভেবে দেখিনি তো।

ভেবে দেখো না একবার?

দাঁড়া দেখছি। নাসিমা এক মুহূর্ত চিন্তা করে। এখন আমার নিজেকে খুব অহংকারী মনে হচ্ছে সালমা।

আচ্ছা নাসিমা'পা বিয়ের কি তোমার খুব দরকার ছিল?

ছিল।

কেন?

আমি মা হতে চাই সালমা। ওই শিশুর জন্য আমার জীবনের একটা পরিণতি দরকার।

সালমার মনে হলো নাসিমা'পাকে আজ ভীষণ লাজুক লাজুক দেখাচ্ছে। পিঠের ওপর ফাঁপানো চুলের গোছা উপচে পড়া খুশির মতো মাতোয়ারা। সালমা দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। নাসিমা একসময় মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কীরে?

কিছু না।

সালমা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। লজ্জাও লাগে। নাসিমা'পা কী ভাবল কে জানে! নাসিমা জীবনের কথা নতুন করে ভাবছে। এক মেরু থেকে আর এক মেরুতে যাত্রা শুরু করেছে। নাসিমার সামনে এখন অনাগত সন্তানের ছবি। তাহলে নাসিমা'পা কি তার ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে চলল?

নাসিমা'পা।

বল।

তোমার এই নতুন ভাবনা দিয়ে তুমি কি নিজেকে অতিক্রম করলে, তোমার পরাজয়?

আমি নিজেকে অতিক্রম করলাম। জীবনকে বাদ দিয়ে সুখ খোঁজা যায় না সালমা। অনেক তো দেখলাম, আর কত? পরাজয়ের কথা আমি। ভাবতে পারি না। পরাজিত যারা তারা পিছু হটে। আমি তো পিছু হটিনি। আমি তো সমান শক্তি নিয়ে নতুনকে গ্রহণ করতে যাচ্ছি। সে পথেও আমার জন্য অনেক গন্ধ ছড়ানো গোলাপ আছে।

সালমা হাসল।

তুমি অনেক পারো।

নাসিমা হেসে কাজে মন দিল। বুড়ি ঝি চা দিয়ে গেল সালমাকে। জেসমিন টি। চমৎকার গন্ধ আসছে।

তোমার চাতেও আজ অন্য স্বাদ নাসিমা'পা।

হবেই তো। সব ঢেলে সাজাচ্ছি যে!

হ্যাঁ, এমন জেসমিন টির মতো সুগন্ধময় হও তুমি।

বাব্বা তুই তো বেশ গুছিয়ে-গুছিয়ে কথা শুরু করলি সালমা।

সালমা একটু একটু করে চা খায়। গন্ধটা বেশ আরামদায়ক। নাসিমা টেলিফোনে কাকে যেন আসতে বলছে। তখুনি একগাদা প্যাকেট হাতে সাব্বির ঢোকে।

এই যে সালমা কী খবর?

কগ্রাচুলেশনস সাব্বির ভাই।

হুঁ, তুমি দেখি আগে আগে সব খবর নিয়ে বসে আছ। আমার জন্য কিছু বাকি রাখোনি।

এমন সুখবর কি কেউ বাকি রাখতে পারে সাব্বির ভাই?

তাই তো দেখো নাসিমা, সালমা কিন্তু খুব চালাক হয়ে গেছে। শুধু চালাক নয়, বাকপটুও হয়েছে। দেখো তো সালমা এই কাতানটা তোমার আপাকে কেমন মানাবে?

আমি কেন নাসিমা'পাকেই জিজ্ঞেস করুন না?

ওর কি এখন পছন্দের সময় আছে? ও তো এখন যেটা দেখবে সেটাই পছন্দ করবে। কী বলো নাসিমা?

বেশি বাজে বোকো না। তোমার বন্ধু হাশেমকে আসতে বলা হয়নি?

তুমি বলে দাও। টেলিফোন গাইডের উল্টো পিঠে নাম্বারটা আছে দেখো।

সাব্বির হাত-পা ছড়িয়ে সোফায় এলিয়ে পড়ে। বুড়ি ঝি চা দিয়ে যায়। গুনগুনিয়ে গান গায় সাব্বির। সালমার মনে হয় এখানে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ওর। এদের কারোরই নাড়ির সূত্র ধরতে পারছে না ও। এরা আজ অন্য জগতের বাসিন্দা।

মুখটা অমন গম্ভীর করে বসে রয়েছে কেন সালমা?

কই? না। সালমা জোর করে হাসার চেষ্টা করে।

উঁহু তোমার মনটা আজ খারাপ বোধহয়?

মোটই না। সালমা হেসে ওঠে।

বেশ তাহলে গান বাজাও।

সালমা চেঞ্জার চালায়। সাব্বির জুতোসুদ্ধ টেবিলের ওপর পা উঠিয়ে দেয়। পা নাচায় আর চা খায়। পা নাচায় আর গান শোনে।

টেলিফোন করা শেষ করে নাসিমা চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি আমার নতুন টেবিলক্লথের ওপর পা তুলে দিয়েছ সাব্বির?

আমার এই পা জোড়ার চাইতে তোমার টেবিলক্লথটাই কি বড় নাসিমা?

কথা তো সেটা নয়। কথা হলো, কেতাদুরস্ত থাকা।

বেশ এই পা নামাচ্ছি। তবে জেনে রেখো নাসিমা, আমার এই খ্যাপামি কিন্তু তোমার সাজানো গোলাপ বনে মাতাল বাতাসের মতো।

তা কি আর জানি না।

নাসিমা সাব্বিরের আনা প্যাকেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে শোবার ঘরে চলে যায়। সালমা জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। গান শুনেও শোনে না। মনে ঝড়। আজ ওদের এত আনন্দ কিসের? এর উৎস কোথায়? ভোগ? তা কেন হবে? দুজনেই তো একত্রে বাস করছে। সেটায় তো কোনো বাধা ছিল না। সামাজিক স্বীকৃতি? সেটার জন্য তো ওদের খুব মাথাব্যথা নেই। তবে কী? কিসের জন্য ওদের এত রঙের ঝরনা বইছে? সালমা কিছুতেই উত্তর খুঁজে পায় না। বাইরে আলো কমে আসছে। আমগাছের মাথার ওপর মরা রোদ। সময় এগোচেছ। সালমার বুক কাঁপে। আর কিছুক্ষণ পর–আর কিছুক্ষণ পর। না থাক। দূরে এক সারি সাদা বক উড়ে যায়। আকাশে ঘেঁড়া মেঘের দল।

অ্যাই সালমা, তুমি কী ঘুমোচ্ছ নাকি?

কী যে বলেন সাব্বির ভাই!

সালমা হেসে সহজ হবার চেষ্টা করে।

আপনি আজকে একদম ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন।

তাই নাকি?

সাব্বির হেসে ওঠে।

অ্যাই নাসিমা, দেখো সালমা আজ কেমন মুরব্বি হয়ে গেছে।

সালমা তুই আমার এখানে চলে আয়।

সেই ভালো।

সালমা শোবার ঘরে যায়। নাসিমা কাপড়, গয়না, প্রসাধনী সব বের করে খাটের ওপর সাজিয়েছে। শোবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিংটা পর্যন্ত বদলিয়েছে নাসিমা। খাটজুড়ে ফুলের মালা আর। ফুলের পাপড়ি ছড়ানো।

সালমার মনে রকিবের চিন্তা ঘুরপাক খায়। রকিব আর কোনোদিন ওর খোঁজ করেনি। সালমার মনে হয় ওর কোনো ভালোবাসার জগৎ নেই। ভালোবাসার অধিকারকে অস্বীকার করতে গিয়ে ও ভালোবাসা হারিয়েছে।

তুই বোস সালমা, আমি আসি।

নাসিমা ড্রইংরুমে যায়। সালমা শাড়ি, গয়না, প্রসাধনীর দিকে অর্থহীন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যা ঘনায়। একে একে বন্ধুরা আসে ওদের ছোট বাসায় ঠাসাঠাসি করে লোকে। কাজি আসে। বিয়ে পড়ানো হয়ে যায়। সালমা মনের মতো করে নাসিমাকে সাজায়। মনে হয়, একটা ইচ্ছের পাখির গায়ে পালক পরাচ্ছে ও। সেই ইচ্ছের পাখি নাসিমার লাল বেনারসি শাড়ির মতো উজ্জ্বল ঐশ্বর্যময়। চন্দনের গন্ধ সালমাকে আবিষ্ট করে রাখে। রাতের খাওয়া খেয়ে অতিথিরা চলে যায়। রাত বেশি হয়নি। বাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সালমা ছটফট করে। একসময় ওদের কাছে বিদায় নিয়ে ও নিচে নেমে আসে। প্রতিটি সিঁড়ির ধাপ এক একটি দীর্ঘ মরুভূমির মতো মনে হয় সালমার। মনে হয় ভয়ানক এক লু হাওয়ার ভেতর দিয়ে পেরিয়ে এলো ও। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বিধ্বস্ত। বারান্দায় মা আর সাকিব বসেছিল। আজ ওদের কোনো ভয় পেল না সালমা। মার পাশের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ল। কৌতূহলী সাকিবই প্রশ্নটা করে আগে, ওপরতলায় কী হলো দিদিভাই?

আজ ওদের বিয়ে হলো।

বিয়ে।

মার বিস্ফারিত দৃষ্টি সালমার মুখের ওপর এসে পড়ে।

বিয়েই যখন হলো তখন এত খেমটা নাচের কী দরকার ছিল?

মা বিচিত্র মুখভঙ্গি করে গুহ করে। সালমা চুপচাপই থাকে। বলবার কী আছে! মার দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা। যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা জাতীয় মনোভাবে কারো সপক্ষে কিছু বলা শোভন নয়। সালমা শব্দ করে হাই ওঠায়।

ঘুমুতে যাও লিমা।

হঠাৎ করেই ও প্রশ্ন করে, তোমরা কি আমার জন্যই বসেছিলে?

নয়তো কী? তোকে যে আমি দোতলায় যেতে দেখেছি দিদিভাই। নইলে তো মা আমাকে বাইরে খুঁজতে পাঠাচ্ছিল।

অ।

সালমা ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে। সাকিবও উঠে চলে যায়। মা বসে থাকে। রান্নাঘরে আনুর মার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা বসে থাকবে। সালমা দরজা বন্ধ করে দেয়। লাইট অফ করে। তারপর শুয়ে পড়ে। বাতাসে নেটের মশারি কাপে। আমড়া গাছে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকে। সালমার ঘুম আসে না। আপ্রাণ চেষ্টা করে, তবু ঘুম আসে না। বৃষ্টির স্রোতের মতো দোতলার ঘরটা ভেসে যায়। এক টুকরো ছবি হয়ে যায়। ওরা এখন কী করছে? সালমা ভাবতে চাইল। বালিশের নিচে থেকে হাতঘড়িটা দেখতে চেষ্টা করল; পারল না। চাদের যে তেরছা আলো ঘরে এসে ঢুকেছে তাতে ঘড়ি দেখা যায় না। বাগানের হাস্নাহেনা গাছ থেকে মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। সালমা জোরে জোরে শ্বাস নিল। না ঠিক তেমন গন্ধ নয়, যে গন্ধ ওদের বিছানায় ছড়ানো ফুলের ভেতর থেকে উঠে আসছিল। সে গন্ধটাও ছিল নতুন। ঘুরেফিরে সালমার মনের ভেতর একরাশ রং কখনো দলা হয়ে, কখনো টুকরো হয়ে ভাসতে লাগল। দোতলার ঘর দুটি যেন রঙের আকাশ হয়ে গেল। সালমা আবার ভাবল, ওরা এখন কী করছে? গান শুনছে না শুয়ে শুয়ে গল্প করছে? নাকি... সালমা আর ভাবতে পারল না। অন্ধকার ঘরে একা একা লজ্জা পেল। লজ্জায় বালিশে মুখ গুজে রইল। মনে হলো, কোনোকিছুই তো ওদের জন্য

নতুন কোনো ঘটনা নয়। তবু ওদের চারপাশে এত বর্ণ কেন? ওরাই বা কেন এত বর্ণোচ্ছল? দোতলায় শব্দ হলো। হয়তো চেয়ার টানার। সালমা কান খাড়া করল। না আর কোনো শব্দ নেই। আবার চারদিক নিঝুম। সালমা বিছানা ছেড়ে উঠল। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে মোম বের করে জ্বালল। ঘড়ি দেখল। রাত একটা। বেশ রাত হয়েছে অথচ ঘুম আসছে না। বাথরুমে ঢুকে মুখ হাতে পানি দিল। মোমটা বাতাসে কাঁপছে। সালমা কখনো কখনো লাইটের বদলে মোম জ্বালায়। চোখ ধাধানো আলো ওর ভালো লাগে না। অনেক রাতে সুইচ টিপে লাইট জ্বালালে মনে হয় সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে ও আলগা হয়ে গেছে।

সালমা আবার বিছানায় শুলো। মোমটা নেভাল না। বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ওটা একসময় নিভে যাবে। যতক্ষণ নিভবে না ততক্ষণ সারা ঘরে একটা লম্বা ছায়া এপাশ-ওপাশ করবে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে অনেক সময় যায়। তবু ঘুম আসে না। এখন কী করছে ওরা। ওরা কি রঙের সাগরে পানসী ভাসিয়েছে? হঠাৎ সালমার চোখের সামনে থেকে দ্রুত অন্ধকার সরতে থাকে। অনবরত থাকে। এ সত্যটা একবারও সালমার মনে হয়নি। আশ্চর্য, কী করে ভুলে গেল ও! আজ রাতে ওরা বীজ বুনবে। উত্তেজনায় সালমা বিছানায় উঠে বসে। বীজ বোনার জন্যই তো ওদের এত আয়োজন। ওদের চারপাশে এত রং। বীজ বোনার জন্যই তো ওদের জীবনে রঙের আবির্ভাব। ওদের চোখে এখন ফসলের স্বপ্ন। ফসলের সোনালি ঐশ্বর্য। এতদিন ওরা যা করেছে তাতে যত আনন্দই থাকুক সৃষ্টির উল্লাস ছিল না। সৃষ্টি আজ ওদের কাছে মহিমান্বিত হবে। ওদের ফসলের জমি বৃষ্টির তোড়ে ভেসে যাচ্ছে।

বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মোমটা নিভে যায়। সারা ঘরে জমাট অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। সালমা শুয়ে পড়ে। উত্তেজনা শান্ত হয়ে গেছে। প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। মূল সূত্রটা ধরতে পারছে না বলে এত গড়বড়। ওদের সারাদিনের আচরণের একটা অর্থ খুঁজে পায় সালমা অথচ এটা ওর আগেই মানে হওয়া উচিত ছিল। শুয়ে শুয়ে নিজের আঙুল কামড়াল। যে সত্যের জন্য জীবনের সমস্ত অর্থটাই পাল্টে নিল ওরা সেটাই সালমার মগজে ঢুকছে অনেক পরে। তবু একটা স্বস্তি পেল ও। কিছু প্রশান্তিও যেন।

আর তখনই রোদ পোড়া-মাঠে আকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টির মতো ঘুমের ধারা নামল। আর কিছুই জানল না সালমা।

নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোনো সঙ্গী নেই

সালমা ভেবে দেখল নিঃসঙ্গতা ছাড়া এখন আর ওর কোনো সঙ্গী নেই। সারাক্ষণই একলা হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছেলেমেয়ের মধ্যে চলতে চলতে ও অনুভব করে নিরন্তর শূন্যতা। চারপাশে এত লোক, এত হাসি, এত প্রাণবন্যা, তবু কী যেন নেই। চোখ বুজে শুয়ে থাকলে বুকটা চেপে আসে। মুচড়ে ওঠে। তারপর কাঁদতে ইচ্ছে করে। জোর বাতাস বইলে কান্না আসে। বৃষ্টি হলে কান্না আসে। তখন সালমা অনবরত মনের সমুদ্রে সাঁতরায়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত হয়ে যায়।

বই-খাতা বুকে নিয়ে রোজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়। লেকচার শুনতে হয়। পরীক্ষা এগিয়ে আসাতে সবাই ব্যস্ত। রকিব ওকে এড়িয়ে চলে। দেখা হলেও কথা বলে না। চোখাচোখি হলে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। সালমা নিজে থেকেও কথা বলে না। উৎসাহ পায় না। বান্ধবী নাজ একদিন যেচে বলে, তেদের কি ঝগড়া হয়েছে সালমা?

ঝগড়া? সালমা চোখ কপালে'তোলে, যেন এ শব্দটা নতুন শুনছে।

না, আমরা সবাই দেখছি, রকিবের সঙ্গে তোর আর তেমন ভাব নেই। দুজনে কেমন ছাড়া ছাড়া।

ও এই। সালমা জোর করে হাসে, হাসতেই থাকে।

অত হাসির কী হলো?

তোরা যে আমাদের ওপর বেশ নজর রেখেছিস, সেটা জেনে খুশি হলাম।

রকিব মনমরা হয়ে গেছে।

কাপুরুষ। জীবনকে ফেস করতে পারে না।

নাজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এতদিন ধরে তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব, তবু তোকে বুঝতে পারলাম না সালমা।

সেটা হলে তো আমাদের কোনো সমস্যাই থাকত না।

রকিবের জন্য তোর খারাপ লাগে না?

মাঝে মাঝে লাগে।

একসময় তুই ওর জন্য পাগল ছিলি।

সময় তো ফুরিয়ে যায়নি।

কী জানি বাবা বুঝি না।

নাজ হাত ওল্টায়। সালমা হাসে।

যাক তোকে অত বুঝতে হবে না। চল নাজ, সিনেমা দেখে আসি, একটা ভালো বই হচ্ছে মধুমিতায়।

কী বই?

স্পার্টাকাস।

ও খুব ভালো। চল।

সিনেমা হলের অন্ধকারে সালমা আবার নিজের অন্তর হাতড়ায়। মনে হয় নিজ অন্তরের সব সীমানা ভেঙে গেছে। তেপান্তরের মাঠের মতো। এলোপাতাড়ি বাতাস বয় কেবল। রকিব একটা দুরন্ত রাগী যুবক হতে পারে না। সিনেমার নায়কের মুখটা সালমার অন্তরে ঘোরাঘুরি করে। নায়িকার নীল পোশাক সালমাকে পেলব অনুভূতিতে ছেয়ে দেয়। ওদের ভালোবাসা? সালমা ভাবতে পারে না। ওদের বিদ্রোহ? ওদের যুদ্ধ আর তখনই মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। রকিব তুই, কিছু না। আচ্ছা রকিব, তুই কেন আমার ওপর জোর করলি না? তুই কেন আমাকে বুনো ঘোড়ার ওপর চড়িয়ে দিগ্বিদিক ছুটে গেলি না? আমি তো সেই রকম একটা যুবক চাই। কাউকে আমার ভালো লাগে না। কাউকে না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আমার বুকের ভেতর তুষের আগুনের মতো জ্বলে। আমি জীবনটাকে টুকরো টুকরো ছিন্নভিন্ন করতে চাই। জীবনের পেলব অনুভূতির নীল সরোবরে আমার ঘৃণা। তুই সব জানিস রকিব। আসলে তুইও আমাকে বুঝতে পারিস না। সে জন্যই নীরবে সরে গেছিস। দুর্বল ভাবাবেগ নিয়ে কেউ কোনোদিন জিততে পারে না। পদে পদে ঠকে পায়ে পায়ে মার খায়। তোর মধ্যে আমি এক শক্তিমান পুরুষ দেখতে চাই রকিব।

এই সালমা? কী বিড়বিড় করছিস?

নাজ ওকে ধাক্কা দেয়। সালমা আবার পর্দার ওপর ফিরে আসে। সিনেমার নায়ককে তখন কুশিফাই করা হচ্ছে। নাজের প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না ও। এ বইটা এর আগে দুবার দেখেছে। যতবার দেখে ততবারই ওর নতুন লাগে। আজ সিনেমা হলের অন্ধকারে এক গাদা লোকের সঙ্গে বসে থেকে কেবলই নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হতে ইচ্ছে করে সালমার। নিজের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। আশপাশের অসংখ্য লোক যখন পর্দার বুকে দৃষ্টি ফেলে দিয়ে নিঃসাড়, ও তখন মাকড়সার মতো জাল বোনে। বিচিত্র সে জাল। চিকন সুতো অনবরত মনের লাটাই ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সে সুতোয় নকশা হয়। চিকন সুতোয় জাল বোনা মাকড়সার মতো কি ও নিজেই সে জালে জড়িয়ে যাচ্ছে?

সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখল, জাহিদ চৌধুরী বৈঠকখানায় বসে দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সালমা নিজের ঘরে এলো। সটান শুয়ে পড়ল। গত সপ্তাহে জাহিদ চৌধুরী আমেরিকা থেকে ফিরেছে। বিদেশি জলবায়ু তার চেহারায় বেশ একটা ঝলমলে দীপ্তি

দিয়েছে। জাহিদ চৌধুরীকে এখন আরো স্মার্ট এবং সপ্রভিত মনে হয়। কিন্তু বাবা কার সঙ্গে কথা বলছে? ও লোক দুটোকে সালমা আগে কখনো দেখেনি। বাজে ব্যাপার, ও নিয়ে ভাবার কোনো মানেই হয় না। বাবা যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলুক তাতে সালমার কী এসে যায়। আর এসব অভ্যেস বড় খারাপ। মনকে উদার হতে বাধা দেয়।

সালমা চায়ের জন্য খাবার ঘরে এলো। কেউ নেই। মা আর সাকিবকে দেখল না। রান্নাঘরে এলো। আনুর মা, জলিল মিয়া পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসে। সালমাকে দেখে জলিল মিয়া উঠে দাঁড়াল।

কী চাও আপামণি?

চা খাব।

এই আনুর মা চা বানাও।

মা আর সাকিব কই জলিল ভাই?

তোমার খালাম্মার বাসায় গেছে। আম্মা তোমার জন্য ডিমের হালুয়া রেখেছে আপামণি। খাবার ঘরে এসো।

দুজনে খাবার ঘরে এলো। জলিল মিয়া কাঁধের গামছা দিয়ে টেবিলটা মুছে ফেলল। অন্যদিন যা সে করে না। সালমার মনে হলো জলিল মিয়া এক যেন একটু বেশি তোয়াজ করছে। সালমা মনে মনে হাসল। বুঝল কেন। ভাবল, একবার বলে ফেলে যে এসবের প্রয়োজন নেই জলিল ভাই। তুমি সহজেই থাক। আমাকে দিয়ে ভয় নেই। কিন্তু বলতে পারল না। বদলে চামচে করে ডিমের হালুয়া মুখে পুরল। জলিল মিয়া ফ্রিজ থেকে কলা বের করল, পানির বোতল বের করল। আনুর মা চা নিয়ে এলো। সালমা ইচ্ছে করে কথা ফাঁদল।

দেখো জলিল ভাই, আনুর মা আজকাল বেশ সুন্দর হচ্ছে।

জলিল মিয়া কথা বলতে পারল না। আনুর মা অনুচ্চ স্বরে বলল, কী যে বলেন আপামণি।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তুমি একবার আমার ঘরে আয়নায় গিয়ে দেখো। আজকাল তোমাকে একদম অন্যরকম লাগে। তুমি কিছু বলছ কেন জলিল ভাই? বলো না, আমার কথা সত্যি কি না?

জানি না। আমি মূর্খ মানুষ, অতশত বুঝি না।

জলিল মিয়া আমতা আমতা করে।

সালমা শব্দ করে হেসে ফেলে। আর হাসি চেপে রাখা যায় না।

তুমি খুব চালাক হয়ে গেছ জলিল ভাই। বুঝলেও বলবে না। আনুর মা ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বেচারি লজ্জা পেয়েছে। টেবিলের ওপর সবকিছু গুছিয়ে দিয়ে জলিল মিয়াও আস্তে আস্তে কেটে পড়ে। সালমা কৌতুক বোধ করে। ওরা হয়তো এখন রান্নাঘরে বসে এ নিয়ে মজা করছে। সালমার মনে হয় দুজনের মধ্যে একটা সহজ প্রাণবন্ত ভাব এসে গেছে। দুজনে একটা নির্জন দ্বীপ আবিষ্কার করেছে। এবং অনেক ঢেউয়ের মধ্যে সাঁতরে খুঁজে পাওয়া সে দ্বীপে এখন নারকেলের চিরল পাতার মৃদু বাতাসের শান্তি। সে দ্বীপের সবুজ ঘাসে রঙিন ফড়িংয়ের মেলা। কূলে বসে সাগরের ঢেউ গুনতে গুনতে ওরা কি অতীতকে স্মরণ করে? না, ওরা অনাগতের স্বপ্ন দেখে। সেজন্যই ওদের ভাষার দৃষ্টি স্বাপ্নিক চেহারায় নিজেদের অজান্তেই ফুটে উঠেছে মায়াবী জাদুর স্পর্শে। যে স্পর্শ নিয়ে ওদের নতুন জন্ম, সেখানে আর সব মিথ্যা। সালমার মনে হয়, ওরা ব্যর্থতাকে অতিক্রম করতে পেরেছে। হয়তো কখনো মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে সাকিবের গিটারের মতো টুকরো স্মৃতি টুংটাং করে ওঠে। তাতে কী! সে বেদনা থাকে বলেই তো জীবেনর উপভোগ নিবিড় হয়। সালমা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। ভাবতে ভাল লাগে যে দুটি পোড়খাওয়া মানুষ আবার একটি জগৎ গড়তে পেরেছে। জীবনকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

চা খেয়ে সালমা নিজের ঘরে আসে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে বই নিয়ে বসে। ফ্রেজারের গোল্ডেন বাউ। এ বইটা কয়েকদিন ধরে ও খুব মন দিয়ে পড়ছে। পড়তে ভালো লাগে। পড়তে পড়তে বেদনা ভুলে যায়। সালমার মনে হয় এই একটা চমৎকার ভুবন। কোনো একটা অবলম্বন না খুঁজতে গিয়ে বই নিয়ে বসে থাকা অনেক ভালো। ভাবনার দিগন্তসীমা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়।

আনুর মা এসে ঘরে ঢোকে।

আপামণি, সাহেব আপনাকে ডাকে।

কেন?

আমি তো জানি না।

আনুর মা সালমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে। ফিরিয়ে দেখে। দেখে দেখে সাধ মেটে না। সালমা মুখ টিপে হাসে। ওর বিকেলের কথাগুলো এখন আনুর মার মনের মধ্যে কাজ করছে। ও পরক্ষণে সালমা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বেরিয়ে যায়।

সালমা ভেবে পায় না যে বাবা কেন ডাকল। ও বারান্দায় এসে একটুক্ষণ দাঁড়ায়। ড্রয়িংরুমে বসে রয়েছে বাবা। লোক দুজন চলে গেছে। সালমা ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। বাবার মুখটা গম্ভীর। থমথমে।

কী করছিলে?

পড়ছিলাম।

পরীক্ষা কবে?

সামনের মাসের পনেরো তারিখ।

পরীক্ষা দেবার মতো প্রিপারেশন হয়েছে?

এখনো বুঝতে পারছি না।

কবে পারবে?

দিন পনেরো পর।

তোমার মেধার ওপর আমার আস্থা আছে। তবু যদি পরীক্ষা দেবার মতো অবস্থা তৈরি করতে না পার তবে আমাকে জানিয়ে। সে অনুযায়ী আমি আমার সিদ্ধান্ত নেব।

সিদ্ধান্ত।

সালমা চমকে উঠে চোখ বড় করে। বাবা হাতের কাগজের ওপর দৃষ্টি নামিয়ে রেখেছে। সালমার সঙ্গে আর কোনো কথা বলার ইচ্ছে তার নেই। ও সেটা বোঝে। তবু একটু জোর দিয়ে বলে, কিসের সিদ্ধান্ত?

সে তোমার এখুনি জানার দরকার নেই। সময়মতো জানাব। যাও, পড়গে।

বাবার রূঢ় আচরণের জন্য সালমা প্রস্তুত ছিল না। একদম হকচকিয়ে যায়। এতদিনের ঠাণ্ডা স্নেহময় কন্ঠ আজ কী কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেল ও তা বুঝতে পারছে না। তবু বাবাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না। নিঃশব্দে উঠে আসে। মনে মনে হাসে। বিদেশ থেকে বাবা কি একটা বিদেশি মেজাজও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে? নাকি ওদেশে জ্ঞান বিতরণ করতে পারার গৌরবে অহংকারে পেয়ে বসেছে। যাকগে। ওইসবে সালমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু মন থেকে ওড়াতে চাইলেও সবকিছু ওড়াতে পারল না। সিদ্ধান্ত শব্দটা মনের মধ্যে দৌড়ে বেড়ায়। কিসের সিদ্ধান্ত? জাহিদ চৌধুরীর ক্ষমতা সম্পর্কে তো ওর জানা আছে। বড়জোর ওকে একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারে। এর বেশি আর কী করবে? সেটা যদি করেই তার জন্য সালমার কোনো পরোয়া নেই। সেটা

নিয়ে জাহিদ চৌধুরীর মুখখামুখি হতে পারার মতো মনের জোর ওর আছে। আর তখুনি সালমা ঠিক করে ফেলে যে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। যা সময় আছে সে সময়টুকু ও পুরোপুরি কাজে লাগালে ও একটা ভালো সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে মনটা খারাপ হয়ে যায়। এখন থেকে কেবল মাপা মাপা ছাঁকা ঘঁকা বই পড়তে হবে। ইচ্ছেমতো যেটা খুশি সেটা আর টেনে পড়া যাবে না।

বাইরে মা আর সাকিবের মৃদু কথা শোনা গেল।

দুজনেই হাসছে। সালমা গরজ করল না। সাকিব ঢুকল ওর ঘরে।

কীরে দিদিভাই কী করছিস?

দেখতেই তো পাচ্ছিস।

আজ খালার বাসায় গিয়েছিলাম।

কেন?

এমনি। বেড়াতে। যা মজা হলো না ওখানে। সব একদম ঠিক হয়ে গেল।

কিসের ঠিক?

ও কিছু না। যাই বাবা আবার আমার জন্য বসে রয়েছে কি না।

সালমা কোনো কথা বলল না। সাকিব যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। ও এমন একটা ভাব কর যেন কোনো কিছুতেই ওর কোনো কৌতূহল নেই। তবে ভেতরে ভেতরে কিসের আয়োজন চলছে তা ও টের পেল। তুমি জাহিদ চৌধুরী আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে? তুমি সিদ্ধান্ত নেবার কে? সেই ক্ষমতা কি তুমি অর্জন করেছ? তবু তোমার পরিবর্তনে আমি আনন্দিত। সব রকম পরিবর্তনই আমাকে আনন্দ দেয়। ভালো। দেখি তুমি কতদূর এগোতে পার। তোমাকে তো জানি চরিত্রের কোনো স্থিতি

নেই। যেদিকে বাতাস বয় সেদিকেই এগোতে থাকো। উল্টো বাতাসের মুখোমুখি কি কোনোদিন দাঁড়িয়েছ? দাঁড়াওনি। কিন্তু আমি জানি কেমন করে উল্টো বাতাসের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। তুমি আজ জোর গলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছ? বেশ ব্যাপার। বোঝা যাচ্ছে, তুমি শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করছ। করো, পারলে যা খুশি করো। তুমি তোমার মধুকন্ঠকে বজ্রকন্ঠে পরিণত করেছ। তুমি তোমার শ্যামল অন্তর রুক্ষ করেছ। আমার কিছু যায় আসে না তাতে। আমি ওইসবে কমই ভয় পাই। তুমি জানো না আমি কেমন মাল। তুমি যত কঠোর হবে আমি ততই শান্ত হয়ে যাব। বুঝবে না কোথা দিয়ে নতুন করে সুড়ঙ্গপথ তৈরি হবে। জাহিদ চৌধুরী তুমি অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়াও। সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দাও। বই লিখে নাম করো। ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে বিদেশে যাও। ছাত্র-পিটিয়ে মানুষ করার গৌরবে অহংকার বোধ কর। কৃতী ছাত্রকে নিয়ে জোর গলায় কথা বলে আরাম পাও। কিন্তু সত্যি করে বলো তো

জাহিদ চৌধুরী, তুমি নিজের সম্পর্কে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছ কি না? আজ তুমি আরেকজনের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছ। অথচ সেই ক্ষমতাই যে তোমার নেই তুমি তা একবারও তলিয়ে দেখছ না। আমি একটা সামান্য মেয়ে। তোমার ভাষায় একরত্তি মেয়ে। আমি নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। তোমার মতো। বেঁকেচুরে যাই না। তোমার মতো ভুল পথে গিয়ে দীনতার গ্লানিতে হাবুডুবু খাই না। আমি সালমা অনায়াসে সাগর সাঁতরাতে পারি।

আপামণি।

কী?

রাত কত হলো খেয়াল আছে? খাবেন না?

আমার খাবার এই ঘরে দিয়ে যাও আনুর মা।

খাবার টেবিলে সবাই বসে আছে। আপনাকে ডাকে।

বলো গে আমি একটু পরে খাব।

আনুর মা চলে যায়। দুলাইন পড়তে না পড়তে আবার আনুর মা আসে।

আপামণি সাব রেগে গেছেন। জলদি আসেন।

সালমা উঠে এলো। খাবার ঘরের পরিবেশ থমথমে। সাকিব মুখ নিচু করে খেয়ে চলেছে। মা জলিল মিয়াকে কী যেন আনতে বলছে। বাবা চোখ বড় করে বলল, তোমাকে কতবার ডাকতে হবে লিমা?

সালমা কথা না বলে চেয়ার টেনে বসে।

কথা বলছ না যে? বাবার কণ্ঠে জেদ।

আমি পড়ছিলাম। ঠিক করেছি পরীক্ষাটা দিয়ে দেব।

বড় চট করে সিদ্ধান্ত নিলে যে?

মনের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই তো সেজন্য চট করেই সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

কথাবার্তাগুলো সাবধানে বলো। তোমাকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছি।

আমি কোনোদিন তোমার আদর চাইনি। সালমার কণ্ঠে উষ্মা।

কী বললে?

যা বলেছি তুমি তো শুনতে পেয়েছ।

আহ্, সালমা চুপ করো।

মা ধমকে ওঠে। সালমা আর কথা না বলে খেতে আরম্ভ করে। জাহিদ চৌধুরী কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকে।

নাও, শুরু করো। তুমি বাবা হয়ে যদি মাথা গরম করো তাহলে চলে নাকি? ও তো বুদ্ধি হবার পর থেকে ধরে নিয়েছে যে, ও এই সংসার থেকে আলাদা।

জাহিদ চৌধুরী ততক্ষণে খেতে শুরু করেছে। রাগে উত্তেজনায় কথা বলতে পারে না। সালমা নির্বিকার। বারবার বাবার স্নেহময় শীতল কন্ঠ জলের স্পর্শ নিয়ে কানে এসে লাগে। কিন্তু জাহিদ চৌধুরী একরত্তি মেয়ের কাছে হারবে না বলে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করেছে। তার জেদ চেপেছে। হ্যাঁ, মানুষের এই পরিবর্তন মন্দ না। তাতে জীবনে একটা বৈচিত্র্য আসে। সালমা অল্প খেয়ে উঠে পড়ে।

কী, হয়ে গেল? বাবার কন্ঠ গম্ভীর।

হ্যাঁ।

এই মাংসগুলো খেয়ে ফেল। না খেলে ভালো করে পড়া যায় না। সালমা শিক্ষক-পিতার অযাচিত উপদেশ নির্বিবাদে শোনে এবং ধপ করে বসে পড়ে চেয়ারে চটপট মাংসের টুকর্কো খেয়ে নিয়ে উঠে যায়। সাকিবও ওর সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে বারান্দার বেসিনে দু'ভাইবোন। একসঙ্গে হাত ধুতে থাকে। সাকিবের মুখটা গম্ভীর। সালমা পরিবেশ। হালকা করার জন্য বলে–মিতালির খবর কীরে?

ভালোই আছে।

অনেকদিন দেখি না?

আমার সঙ্গে রোজই দেখা হয়।

অ। তা তুই মুখটা অমন হাঁড়ির মতো করে রেখেছিস কেন রে?

তোর অনেক আচরণ আমার পছন্দ হয় না দিদিভাই।

তাই নাকি? সালমা সকৌতুকে হাসে। তা আচরণটা সকলের সুবিধে মতো করাই বোধহয় ভালো। তাই নারে?

নিশ্চয়।

সাকিব জোর দিয়ে কথা বলে। ওর গলাটা ভরাট শোনায়। কিছুটা পুরুষ পুরুষও। সালমা অবাক হয়। মনে হয় ইদানীং সাকিব বোধহয় নিজস্ব করে কিছু ভাবছে। আর সেজন্যই ওর চোখ-মুখের লাবণ্য বিলুপ্ত হয়ে রুক্ষ ভাবটা ফুটে উঠেছে। সাকিব হাত ধুয়ে ওর নিজের ঘরে চলে যায়। খাবার ঘর একদম নীরব। বাবা-মা দুজনেই কেউ কোনো কথা বলছে না। সালমা ঘরে আসে। মৌরি মুখে পোরে। আবার বই নিয়ে বসে। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। বারান্দা থেকে সাকিবের গিটারের শব্দ ভেসে আসছে। মৃদু। পাখির পালকের মতো হালকা।

আস্তে আস্তে সে সুর বুকের তলে লাফিয়ে পড়ে। যন্ত্রণা নামের শৌখিন অথচ মেজাজি বেহালা-বাদক হয়ে যায়। বুকটা খাখা করে। আবার সালমা তলিয়ে যেতে থাকে।

পরদিন লাইব্রেরির সামনে রকিবের সঙ্গে দেখা হয়। শুধু দেখা নয় দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। সালমার বুকটা নেচে ওঠে। মনে মনে ও বুঝি রকিবকেই কামনা করছিল। মনে হয় কয়েক যুগ ধরে রকিবের সঙ্গে ওর দেখা নেই। রকিব একমাথা বড় বড় চুল নিয়ে ওর সামনে। দাঁড়িয়ে। জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে সুখের কাপন। সালমার বুকের ভেতর কথা আটকে যায়। রকিব মুখ খোলে আগে।

কোথায় যাচ্ছিস?

লাইব্রেরিতে।

পরীক্ষা দিবি?

হ্যাঁ।

কথাটা রকিব বিশ্বাস করতে পারে না। অবিশ্বাস্য কণ্ঠে আবার জিজ্ঞেস করে, পরীক্ষা দিবি?

হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোর বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

সালমা এক পলক হাসে।

জানিস ওই কাগুজে ডিগ্রিটাকে সম্বল করে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে আমাকে।

কী বলছিস?

সে তুই বুঝবি না। তোর খবর কী? কেমন আছিস?

তোর কী মনে হয়? কেমন থাকতে পারি?

ওইসব প্যানপ্যানানি ছাড়।

তাহলে ধরে নে নিজেই।

তুই কেমন আছিস?

ভালোই।

সালমা।

বল? কী থামলি কেন?

থাক। এখন থাক। নিজের সঙ্গে নিজে আরো একটু বুঝে নিই।

রকিবের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সালমা শব্দ করে হাসে।

চল রকিব আমরা ওইদিকে গিয়ে বসি।

খুব যে সহজ হয়ে গেলি? ঠিক আছে চল।

দুজনে ঘাসের ওপর বসে। ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে যাওয়া-আসা করছে। মাথায় ওপর দিয়ে শব্দ করে প্লেন উড়ে যায়। আকাশটা হালকা মেঘের দরুন ছাই ছাই রঙের দেখায়। সালমা হঠাৎ করে আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। আজকাল যখন ওই বোধটা ওকে আঁকড়ে ধরে, তখন কাঁদতে ইচ্ছে করে। আশপাশে কেউ থাকলেও মনের সেই উথালপাতাল ভাব কাটে না। রকিব একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে। সালমা কপালের ওপর থেকে চুল সরায়। বাতাস বারবার চুল উড়িয়ে এনে কপালে ফেলে। রকিবের উজ্জ্বল চকচকে দৃষ্টি অনুসরণ করে সালমা আবার হাসে।

তুই যেন কী বলতে চেয়েছিলি এবার বল রকিব?

তোকে কি কখনো কোনো নিঘুম রাত যন্ত্রণা দেয় না সালমা?

তারপর।

সালমা তোর কি এখনো কোনো সময় হয়নি? আমি ভালোবাসা চাই সালমা। ভালোবাসা ছাড়া বাঁচতে পারি না।

রকিবের দৃষ্টিতে পেরোয়া ভাব। কণ্ঠে মিনতি। সালমা কথা বলতে পারে না। গলার কাছে কী যেন একটা আটকে থাকে। মনে হয় অনেক কথা রকিবকে ওর বলার ছিল। কিন্তু বলতে পারছে না। রকিবকে নিয়ে এক নির্জন দ্বীপে যাবার ইচ্ছে আছে ওর। কিন্তু ডাকতে পারছে না। সালমা অনবরত ডুবে যাচ্ছে। আর সমস্ত পরিপার্শ্ব এক বিরাট তিমির মুখ হয়ে যাচ্ছে। ও যেন দু'হাত দিয়ে সবকিছু ঠেকিয়ে রাখছে। ও যেন। সব বাধা অতিক্রম করে সাফল্যের বন্দরে পৌঁছতে চাইছে।

সালমা?

রকিব ওর হাতের কবজি সজোরে চেপে ধরে। চেহারায় এক জ্বলজ্বলে ঔদ্ধত্য ভাব। যেন ইচ্ছে করলে এখুনি সালমাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারে। ওর হাতের পেশিতে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি কলকল করছে। সালমা সামান্য ব্যথাও পায়।

আহ্, রকিব ছাড়।

না।

চারদিকে ছেলেমেয়েরা ঘোরাঘুরি করছে?

তাতে আমার কিছু আসে যায় না।

তুই কি একটা সিনক্রিয়েট করবি?

দরকার হলে তাই করব।

সালমা মৃদু ধমকের সুরে কিছু অনুরাগ মিশিয়ে বলে, কী পাগলামি হচ্ছে ছাড় না।

রকিব হাত ছেড়ে দেয়। সালমা অনুভব করে সেই ভদ্র বিনয়ী রকিব আর নেই। ও এখন ভালোবাসার অধিকার চায়। পুরোপুরি অর্থে ভালোবাসা চায়। ও দুর্বিনীত হয়ে উঠতে চাইছে। আসলে ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। শুধু আবেগে এখন আর বিশ্বাস নেই। ওর ভেতর ভয়ানক শক্তি কাজ করে। এ উপলব্ধি বোধের সঙ্গে সঙ্গে সালমা ঘামতে শুরু করে। কিন্তু দুজনের কেউই আর আগের সুত্র ধরে কথা বলতে পারে না। রকিব মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। গাঢ় নীল রঙের ঘাসফুল একটুখানি ঝোপের মধ্যে আলো ছড়াচ্ছে। এত সুন্দর রঙটা, রকিব মনে মনে ভাবে, আমার অন্তরের ছায়া হয়ে মাথা উঁচিয়ে আছে। লম্বা লম্বা ঘাসের মাথায় লাল ফড়িং উড়ে উড়ে এসে বসে। সালমা ওই ফড়িং হতে পারে। আমি ফুল। রকিব ভাবল। আমরা এমন মধুর আনন্দঘন ছন্দে জীবনের বৃত্ত ভরিয়ে রাখতে পারি। জীবনটা তো এমনিই।

কখনো ফুল। কখনো ফড়িং। কখনো জুতোর তলে মাড়িয়ে যাওয়া থেতলানো ঘাসের মতো। আহ, সালমা তুই কিছু বুঝতে পারছিস না। আসলে কিছু বুঝতে চাচ্ছিসও না। রকিবের গলা ধরে আসে। কষ্ট। কষ্ট। ওই গাঢ় নীল ফুলের মতো কষ্ট। ফুলটা যেমন ভালোবাসা। তেমনি বেদনাও। ওই ফুলটা সব।

দূরের সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে

সালমা দূরের সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবল, জলিল মিয়া কাল একটা খরগোশের বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, আপামণি তোমার সুখ এনেছি। সালমা ওটার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই বলেছিল, খাঁচায় রেখে দাও। এখন ওটাকে ভয়ানক দেখতে ইচ্ছে করে সালমার। নরম তুলতুলে পেলব শরীরে হাত বুলোতে ইচ্ছে করে। ওটাকে যদি বুকের খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখা যেত? সালমা ভাবল জীবনটা তো এমনই। কখনো খাচা খালি থাকে। কখনো ভর্তি হয়ে যায়। অনবরত যাওয়া আসাই তো জীবন। রকিব তুই কিছু বুঝিস না। বুঝতেই চাস না। জীবন মানেই বাতাসের মতো এলোমেলো বওয়া। কখনো বৈশাখী। কখনো দখিনা পবন। দুটোই সমান। সালমার গলা ধরে আসে। কষ্ট। কষ্ট। ওই খরগোশের সাদা শরীরটার মতো কষ্ট। খরগোশের সাদা শরীরটা যেমন ভালোবাসা তেমনি বেদনাও। ওই খরগোশটাই সব।

মাথার ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে যায়। সালমা মুখটা ঘোরায়। প্লেনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর বলে, তোর প্রিপারেশন কেমন হয়েছে রকিব?

রকিব মুখ ঘোরায়। চোখের দৃষ্টিতে মেদুর ছায়া। নির্জন দ্বীপের সাগর-ঢেউ আটকে আছে ওখানে। মাথা নাড়িয়ে বলে, ভালো।

আমার মনে হচ্ছে, আমিও খুব খারাপ করব না।

তা আমি জানি। মাস দুই পড়লে তুই ফার্স্ট ক্লাস পেতিস। এখন বোধহয় তা পারবি না।

সালমা হাসে। কথা বলে না। রকিব উঠে দাঁড়ায়।

যাবি?

হ্যাঁ, যাই। অনেকটা সময় নষ্ট করলাম।

নষ্ট? কী জানি অনেকটা সময় সঞ্চয় করলাম বোধহয়।

তাই নাকি? নতুন কথা শোনাচ্ছিস যে?

আমি কি কখনো তোকে পুরনো কথা শুনিয়েছি?

তা বটে। আসি সালমা।

রকিব লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢোকে। সালমা সেমিনারের দিকে যায়।

পরীক্ষার দিন পনেরো আগে থেকে সালমা দরজা বন্ধ করে পড়াশোনা শুরু করেছে। কারো সঙ্গে খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আনুর মা ঘরেই খাবার দিয়ে যায়। বাবাও ওঁর ডিসটার্ব হবে বলে খাবার টেবিলে ডাকে না। সাকিব মাঝেমধ্যে আসে। টুকটাক কথা বলে। চলে যায়। সালমা কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। মনে হয় পারবে না। আবার বেয়াড়া মনটাকে বাগে আনে। শান্ত মেয়ের মতো পরীক্ষার পড়া শেখে। মাঝে মাঝে বিকেলে বাগানে নামে। অবশ্যই যেদিন টের পায় যে বাসায় কেউ নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলিল মিয়ার কাজ দেখে। কামিনী ফুলের ওপর মৌমাছি দেখে। সুখ-দুঃখের বাক্সের কাছে গিয়ে বাচ্চাগুলোকে আদর করে। একদিন হঠাৎ করেই নাসিমার বাসায় গিয়ে ওঠে।

নাসিমা ওকে দেখে অবাক হয়।

কীরে এতদিন কোথায় ছিলি? শুকিয়ে গেছিস যে?

পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত।

তুমি এসে ভালো করেছ সালমা। সাব্বির একমুখ ধোয়া ছেড়ে কথা বলে। মুখটা প্রফুল্ল।

কেন সাব্বির ভাই?

দেখছ না বাঁধাছাদা চলছে।

কী ব্যাপার নাসিমা'পা?

আমরা এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি সালমা।

চলে যাচ্ছ? কোথায়?

বনানীতে।

কেন এ বাসা কী দোষ করল?

নাসিমা লাজুক হাসল।

ছোট দু'কামরায় কি আর হয় রে? এখন আমাদের একটা বড় বাসা দরকার।

ব-ড়-বা-সা-।

সালমা বিড়বিড় করল। তারপর হঠাৎ গভীর চোখে নাসিমার দিকে তাকাল। নাসিমাকে একটু রোগা রোগা দেখাচ্ছে। বাসি শিউলির বোটার মতো ফ্যাকাশে। প্রশ্নটা সালমার মনের মধ্যে আনাগোনা করে। ওর এখন আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের দিকে পানসি ভাসিয়েছে। সে পানসির গতিতে এখন অনুকূল হাওয়া। তরতর করে ছুটছে। তাই ওদের এখন বড় বাসা চাই। অনেক বড় বাসা। বড় বাসা না হলে ওদের কাঙ্ক্ষিত ফসলের সংকুলান সম্ভব নয়।

কী ব্যাপার তুমি যেন চিন্তায় পড়েছ সালমা?

আপনারা চলে যাবেন ভাবতেই খারাপ লাগছে।

তাই তো তোমার আপাও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে। কিছুই খেতে পারছে না।

যাহ, কী যে ফাজিল তুমি!

নাসিমা গোপন কটাক্ষ ছুঁড়ে মারে। সালমা দেখেও না দেখার ভান করে। ব্যাপারটা ওর কাছে এখন পরিষ্কার।

কবে যাচ্ছেন আপনারা?

আগামীকাল।

ফোন বেজে ওঠে। সাব্বির ফোনে কথা বলে। নাসিমা একটু কাজ করে কেমন হাঁপিয়ে ওঠে। ডিভানের ওপর পা ছড়িয়ে বসে। সালমা চারদিকে তাকিয়ে দেখল। নাসিমার বাসায় আজ আর কোনো ফুল সাজানো নেই। ফ্লাওয়ার ভাসগুলো সযত্নে একটি ঝুড়িতে ভরা হয়েছে। সাব্বির ফোন ছেড়ে এসে আবার বই গোছাতে আরম্ভ করেছে। বইয়ের শেলফগুলো আজ খালি।

কী ব্যাপার তুমি যে একদম হাত-পা ছেড়ে দিয়েছ নাসিমা?

একটু জিরিয়ে নিই।

দেখ সালমা, শোনো কথা। ভাবখানা এই যেন মাঠে হাল চালাচ্ছে।

আপার শরীরটা একটু খারাপ মনে হচ্ছে?

তা আর হবে না—

দেখো ভালো হবে না বলছি।

নাসিমা উঠে দাঁড়ায়। সাব্বির হাসতে শুরু করে।

বসো বসো। উঠতে হবে না তোমার।

সালমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। কোনো কাজ খুঁজে পায় না। কী করবে বুঝতে পারে না। এই পরিবেশে নিজেকে ভয়ানক অবাঞ্ছিত মনে হয়।

আমি যাই নাসিমা'পা।

কেন, যাবি কেন? বস না।

তুমি তো আচ্ছা মেয়ে সালমা, আমাদের ঠিকানা পর্যন্ত নিলে না?

দিন।

সাব্বির কাগজের ওপর ঠিকানা লিখে সালমাকে এগিয়ে দেয়।

নাও। যখন সময় পাবে তখুনি চলে আসবে।

তোকে মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে পেলে খুব খুশি হব সালমা।

দেখ পরে যেন বিরক্ত হয়ে যেও না।

পাগল। কী যে বলিস।

ঠিক? মনে থাকবে তো?

পরীক্ষা নিস।

আচ্ছা।

ওর সঙ্গে তুমি অত কথা বলো না তাসিমা। দেখো, সালমা হয়তো কোনোদিনই আমাদের ওদিকে যাবেনা।

কীরে ঠিক নাকি?

সালমা হাসে। কথা বলে না। অনেকক্ষণ গল্পসল্প করে বেরিয়ে আসে ও। দরজায় আজ লাল পর্দা নেই। ওরা সব খুলে নিয়েছে। সব বাধাছাদা করছে। ওরা একটা বাসায় যাচ্ছে। সালমা ভাবল ছোট বাসায় ওদের সুখ হয়তো আর আটকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তাই এখন বিস্তার চাই। দেয়ালভাঙা বিস্তার।

বারান্দায় সিঁড়ির ওপর বসে রইল ও। এখনো কেউ বাড়িতে ফেরেনি। কৃষ্ণচূড়ার মাথার ওপাশে সালমা সূর্য ডোবা দেখেনি। আকাশটা লাল হলো। লাল থেকে বেগুনি। তারপর কালচে। সব শেষে নিকষ কালো। জলিল মিয়া ঘরে ঘরে বাতি জ্বালিয়েছে। দূরে একঝক বাদুড় উড়ে যেতে দেখল সালমা। কাঁপা কাঁপা ডানার ফাঁকে টুকরো আকাশ সালমার মনের মধ্যে আঁধার হয়ে নামল। কলাবতী ঝোপ থেকে আর কোনো লাল ফুল মাথা দোলাল না। সালমা টেবিলের সামনে এসে বই খুলে বসল।

সালমার যেদিন পরীক্ষা শুরু হলো সেদিন এ বাড়িতে মিস্ত্রি এলো। গোটা বাড়ি রং করা হবে। দরজা-জানালা ঠিক করা হবে। সাকিব কায়দা করে জিজ্ঞাস করল, বল না দিদিভাই, কী রং করলে বাড়িটা সুন্দর দেখাবে?

সালমা বাঁকা করে তাকাল, এত আয়োজন কেন রে? তোর সঙ্গে মিতালির বিয়েটা তাহলে হয়েই যাচ্ছে?

যা, কী যে বলিস? আমি তো তোর ছোট।

সালমা থমকে গেল। সাকিব বেশ কৌশলে উত্তর দিতে শিখেছে তো। সেই আশ্চর্য ছেলেমানুষিসুলভ কমনীয়তা বিন্দুমাত্র নেই। বড় বড় গোঁফ রেখেছে আবার। গায়ে ভারী হয়েছে বেশ। ও এখন আপন অন্তরে বলিষ্ঠ পৌরুষত্ব লালন করছে। সাকিব নিজেকে অতিক্রম করতে চলেছে। লক্ষণটা মন্দ না। ভালো। সালমার খুশিই লাগল।

গোলাপি রংটা বেশ সুন্দর, ওটাই দিয়ে দিই। কী বলিস দিদিভাই?

কেন সাদা কী দোষ করল?

সাদা? সাকিব আমতা আমতা করে।

খারাপ কী?

যৌবনের রং চাই দিদিভাই। ওইসব সাদাটাদা দিয়ে পোষাবে না। তাছাড়া উৎসব মানেই রঙের সংমিশ্রণ; সে বাহ্যিক এবং মানসিক দুটোই।

সালমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। বিশ্বাস হতে চায় না যে সাকিব এত কথা বলছে।

তাহলে ওই গোলাপিটাই থাক দিদিভাই?

তোর যা খুশি।

সাকিব চলে গেলে সালমার বুকটা ভার হয়ে আসে। ওকে না জানিয়ে ওর সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাহিদ চৌধুরী। তারই তোড়জোড় চলছে বাড়িজুড়ে। ঘনঘন খালারা আসছে। মামা, ফুফু আসছে। কেনাকাটা হচ্ছে। বাবা গম্ভীর। সালমার সঙ্গে হেসেও কথা বলে না। যেন ওর সম্পর্কে যা ভাবা হয়েছে তাই চূড়ান্ত। এ নিয়ে সালমার নিজস্ব কোনো বক্তব্য থাকতে পারে না অথবা কোনোকিছুই ভাবার অধিকারও ওর নেই।

সালমা একদিন পাশের ঘর থেকে বড় মামা আর বাবার কথাবার্তা শুনেছিল। বড় মামা বলেছিলেন, এ বিয়েতে সালমা মত দিয়েছে তো?

ওর আবার মতামত কী? আমরা যা করব তাই মেনে নিতে হবে।

কাজটা কি ভালো হচ্ছে?

খারাপটা কী হলো শুনি? আদর দিয়ে দিয়ে ওকে আমি অনেক নষ্ট করেছি। ও আমার কোনো মর্যাদা রাখেনি। কোনো সুযোগ ওকে আর দেওয়া হবে না।

বাবার কথাগুলো জল্লাদের নিষ্ঠুর কন্ঠস্বরের মতো ভেসে আসছিল। বড় মামা হয়তো চুপ করে গিয়েছিলেন। কেননা আর কোনো কথা ও শুনতে পায়নি। অবশ্য বাবার কথায় সালমার বুক কাঁপেনি। অত দুর্বল স্নায়ু ওর নয়। তবে বাবা নিপুণ কৌশলী। ভূমিকা বদলেছে সযত্নে। সব দেখেশুনে সালমা নীরবতা অবলম্বন করেছে। ফুফুদের, মামাদের সঙ্গে হেসে হেসেই কথা বলে। যেন এ বাড়িতে এমন কিছু হচ্ছে, যার বিন্দুবিসর্গ ও জানে না। পরীক্ষার পড়া ছাড়া ও কিছু বোঝে না। সালমা সবার সঙ্গে আচরণে একটা ছোট্ট সরল বোকা মেয়ে হয়ে যায়। সাকিব মাঝে মাঝে অবাক হয়। সালমাকে ও চেনে। এ আচরণ ওর যথার্থ না ভান বুঝতে পারে না। দিদিভাই এত সহজে সবকিছু মেনে নিচ্ছে? পরক্ষণে ভাবে আসলে সব মেয়েই এক। বিয়ের কথা শুনলে খুশিই হয়। কখনো সালমাকে বলে, দিদিভাই তোকে আজকাল ছটফটে সি-খুশি দেখায়।

পরীক্ষাটা ভালো হচ্ছে তো!

পরীক্ষাটা ভালো, না অন্য কিছু?

সালমা একটুক্ষণ গালে হাত দিয়ে ভেবে বলে, না অন্য কিছু তো খুঁজে পাচ্ছি না।

পাচ্ছিস। পাচ্ছিস। আমাকে বলবি না।

সাকিবের মুখে চাপা হাসি ফুটে ওঠে। সালমা মনে মনে হাসে। তুমি ছেলে সেয়ানা হচ্ছে। আমার সঙ্গে টেক্কা লড়তে এসেছ। লড়ো। দেখি কে জেতে। সাকিব সালমার বেণি টেনে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে যায়।

থার্ড পেপার পরীক্ষার পর হল থেকে বেরোতে রকিব এসে ওকে ডাকে। তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল সালমা।

ওকে দেখে চমকে ওঠে সালমা। চোহরায় অদ্রির ছাপ। চোখজোড়া লাল। চুলে তেল নেই। পাঞ্জাবির বোম খোলা। সালমা কথা না বলে ওর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে করিডরের শেষ মাথায় আসে। একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে সালমা দাঁড়ায়। রকিবের রুক্ষ কন্ঠ চড়চড় করে ওঠে। শব্দটা অনেকটা মড়মড় করে গাছ ভেঙে পড়ার মতো।

আমার সঙ্গে ছলনার কী দরকার ছিল সালমা?

ছলনা?

গতকাল নিউমার্কেটে সাকিবের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ও সব বলল।

আমি কিছু জানি না।

বিয়ের তারিখ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে।

আমি জানি না।

কার্ড ছাপানো শেষ?

আমি জানি না।

কেনাকাটা সব শেষ?

আমি জানি না।

বিয়ের পর তুই কানাডা যাচ্ছিস?

আমি জানি না।

সালমা তুই এত নিষ্ঠুর কেন? আমার জন্য তোর কি এখনো কোনো সময় হয়নি?

অকস্মাৎ রকিবের কন্ঠ খাদে নেমে যায়। সালমা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বলে না।

এত বড় একটা খবর তুই আমাকে গোপন করে গেলি সালমা! আর সাকিব আমাকে করুণা করল। ব্যঙ্গের হাসি হাসল। তোর ওপর আমি জোর করতে পারি। জোর করে একটা হেস্তনেস্ত করতে পারি। কিন্তু তাতে লাভ? ভালোবাসা তো জোরের ব্যাপার নয়। ভালোবাসা তো প্রভুভূত্যের সম্পর্ক নয়। ভালোবাসা পবিত্র সেখানে দুজনের অধিকার সমান। সেটা পারস্পরিক সমঝোতার ব্যাপার।

তুই থাম রকিব।

সালমা জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে, রকিবও সমানভাবে উত্তর দেয়।

আমি তোর শেষ কথা জানতে চাই?

ফোর্থ পেপারটা হয়ে যাবার পর আমি তোকে আমার কথা জানাব।

সত্যি?

বিশ্বাস করতে পারছিস আমাকে?

ওই বিশ্বাস না থাকলে তো আমার ভালোবাসা মিথ্যে।

মাথা ঠাণ্ডা করে পরীক্ষাটা শেষ কর রকিব।

সালমা মুরব্বির মতো কথা বলে। এতক্ষণ পর রকিব হঠাৎ হো হো করে হাসে। সালমা হাসতে পারে না। সাদা দেয়ালে দৃষ্টি ফেলে রাখে। রকিব হাসছে। বেশ প্রাণখোলা হাসি। ওর কষ্টের দ্বীপে ওই হাসি নিঝুম বনের কেওড়া পাখি। বিষণ্নতা কাটিয়ে দিয়ে যায়। পাখা মেলে দিলে চকচকে ডানায় সূর্যের আলো ভরে ওঠে।

চল ওই মাঠে গিয়ে বসি সালমা?

আজ থাক।

কেন?

ভালো লাগছে না।

সালমা?

আমার ভেতরে ভীষণ একটা অস্থিরতা। তোকে আমি তো বোঝাতে পারব না রকিব। খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সব প্রাণীর মধ্যে বোধহয় এমন রিনরিনে যন্ত্রণার কাঁপুনি থাকে। আমি এখন সেই ভয়ানক সময়ের শিশিরে গা ডুবিয়েছি।

সালমা চল তোকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না থাক, আমি একলাই যেতে পারব। এখনো আমার সময় হয়নি রকিব।

সালমা হাঁটতে আরম্ভ করে। রকিবও ওর পাশে পাশে হাঁটে। সালমার পিঠে লম্বা বিনুনি দোলে। ছাপা শাড়িতে ওকে আজ জংলি মেয়ের মতো দেখাচ্ছে। চুলগুলো বারে বারে কপালে এসে পড়ে। রকিবের লোভ হয়। ইচ্ছে করে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেতে, ঠোঁট ঘষে ঘষে ওই কপাল থেকে চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দিতে, লম্বা নখ সংবলিত সরু আঙুলগুলো নিজের মুঠিতে ধরে রাখতে। কিন্তু হয় না। আশপাশ দিয়ে ছেলেমেয়েরা

যাওয়াআসা করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একটু ক্লান্ত দেখায় সালমাকে। একটু অন্যমনস্কও। ও গভীরভাবে কিছু ভাৰছে। রকিব ভাবল। একটা রিকশা ডেকে তুলে দেওয়ার পরও সালমা বেশি কথা বলল না। কেবল বলল, আসি।

রকিব ভেবেছিল সালমা আরো কিছু বলবে। আরো একটু অন্তরঙ্গ হবে রকিবের সঙ্গে। কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে সে সম্পর্কেও। জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সালমা কিছু বলল না। শুধু একরাশ ক্লান্তি ফেলে রেখে গেল রকিবের জন্য। ওর ক্লান্ত মুখটা বারবার ভেসে ওঠে রকিবের সামনে।

রিকশা থেকে নামতেই সালমা দেখল বাবা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে। মিস্ত্রিদের কাজের তদারক করছে। জলিল মিয়া ফুলের বেড পরিষ্কার করছে। সালমা খুব সন্তর্পণে কাঠের গেটটা খুল। এ বাড়ির প্রতিটি জিনিসের ওপর ওর খুব মায়া হচ্ছে। গেটটায় তবু ক্যাচ করে একটা শব্দ হলো। জলিল মিয়া ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। সালমা সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, পরীক্ষা কেমন হলো?

ভালো।

সালমা পাশ কাটিয়ে ঘরে উঠে গেল। এর বেশি কোনো কথা কেউ বলল না। অন্যদিন হলে বাবা খুঁটিনাটি অনেক কথা জিজ্ঞেস করতেন। সালমা বইখাতা টেবিলে ছুড়ে মেরে বাথরুমে ঢুকল। মুখ-হাত ধুয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মাথা ধরেছে। নসিয়ার মতো লাগছে।

আনুর মা চা দিয়ে গেল। হয়তো আনুর মার কাছে শুনে মা এলো।

কীরে শরীর খারাপ নাকি?

মাথা ধরেছে।

মাথার আর দোষ কি। চার ঘণ্টা একনাগাড়ে পরীক্ষা দেওয়া কি কম কথা? একটা নোভালাজিন খেয়ে নে।

পাঠিয়ে দাও।

একটু পরে মা নিজেই এলো নোভালজিন নিয়ে। সযত্নে খাইয়েও দিলো। মাথার কাছে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সালমা বুঝে পেল না হঠাৎ এত আদর কেন? ওর খুব খারাপ লাগল। এই মুহূর্তে কেউ না থাকলেই ভালো। এক একটা সময় আসে কেউ না থাকলে খারাপ লাগে–এক এক সময় কেউ থাকলে। সালমা চাইল মা চলে যাক। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। ভাবল আর কটা দিনই বা। ও ইচ্ছে করেই পাশ ফিরে শুলো। ঘুমের ভান করল। মা আস্তে উঠে গেল। যাবার সময় দরজা বন্ধ করে দিল। সালমা ভাবল সোমবার পরীক্ষা, আজ বৃহস্পতিবার। মাঝে আর কটা দিন। অসংখ্য চিন্তা এলো মনে। কয়েক হাজার মতো তা গেঁথে গেল মনে। স্মৃতিটা বড় কষ্টদায়ক। সালমা বিছানা ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালু আবারো ভাবল, স্মৃতিটা বড় কষ্টদায়ক। একবার বাবা ওকে একজোড়া লাল জুতো কিনে দিয়েছিল। ঘুরেফিরে সে জুতো জোড়ার কথা মনে পড়তে লাগল ওর। স্মৃতিটা কখনো লাল।

আস্তে দরজা ঠেলে জলিল মিয়া ঢুকল। হাতে এক তোড়া ফুল। দুই গাছি বকুলের মালাও।

আপামণি।

কী ব্যাপার জলিল ভাই?

তোমার জন্য ফুল এনেছি।

সালমা হাত বাড়িয়ে ফুল নিল। জলিল মিয়া ওকে আর কখনো ফুল দিয়েছে কি না তা মনে পড়ল না সালমার। ও ধরে নিয়েছে সালমার বিদায়লগ্ন আসন্ন। সে জন্য ফুল দিতে এসেছে।

আপামণি।

বলো।

এবার তো সত্যি তুমি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ আপামণি।

জলিল মিয়া গামছা দিয়ে চোখ মোছে। গলাটা কেশে পরিষ্কার করে। সালমার নিরুত্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, সাকিব ভাই বলেছিল বাসরঘর সাজানোর জন্য অনেক ফুল দরকার, তোমার কী কী ফুল পছন্দ বলো?

আমার সব ফুল পছন্দ জলিল ভাই।

তবু কোনটা বেশি ভালো লাগে?

গোলাপ। লাল গোলাপ।

আচ্ছা।

জলিল মিয়া হেসে মাথা নাড়িয়ে চলে গেল। ও খুব খুশি হয়েছে। ওই গেঁয়ো লোকটাকে কষ্ট দিতে চায় নি ও। সালমার একটা মুখের কথায় ও যদি ক্ষণিকের আনন্দ পায় তাহলে দোষ কী? বকুলের মালা দুটো ও হাতে জড়িয়ে রাখল। তোড়াটা নাকের কাছে উঠিয়ে গন্ধ শুকল। গন্ধে বুকটা ভরে যায়। পবিত্র মনে হয় নিজেকে। জীবনের কতগুলো সময় এমনি পবিত্র। কেউ তাকে কলুষিত করতে পারে না।

রোববার সারাদিন সালমা নিজের ঘরে কাটাল। কেউ ওকে বিরক্ত করল না। আনুর মা কয়েকবার এসে এটা-ওটা দিয়ে গেল। মনে মনে বলেছিল, সব শাড়ি তুমি নিয়ে যাও আনুর মা। ওতে আমার আর দরকার নেই। কিন্তু বলতে পারেনি। আনুর মার ওপর মায়া হয়েছিল। বেচারি বিশ্বাস করতে পারবে না। মনে মনে কষ্ট পাবে। কষ্ট কাউকে ও আর দিতে চায় না।

রাতে সাকিব আসে গয়নার বাক্স হাতে নিয়ে।

দেখ তো দিদিভাই কেমন হয়েছে?

খু-উ-ব সুন্দর!

তোর পছন্দ হয়েছে?

হ্যাঁ।

যাক, বাঁচলাম।

ডিজাইন কে পছন্দ করেছে রে?

বড় খালা আর মা। আমিও সঙ্গে ছিলাম।

তুই সঙ্গে থাকলে কোনো জিনিস কি খারাপ হবার উপায় আছে?

থাক, বেশি পাম্প দিতে হবে না।

সাকিব কুশিতে ডগমগ হয়ে বেরিয়ে যায়। সালমা বইয়ের পাতায় মনোযোগ দেয়। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। সব মুছে গিয়ে বইয়ের পাতার ওপর কেবল দক্ষিণ সাগরের একটি দ্বীপের ছবি ভেসে ওঠে। সাগর দিয়ে ঘেরা, নারকেলবীথির ছায়া দিয়ে ভরা একটি মনোরম দ্বীপ।

সোমবার সকাল থেকে সালমা এক লাইনও আর পড়তে পারে না। বুকটা কেমন যেন করে। বাথরুমে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেয়। অনবরত গায়ে মাথায় পানি ঢেলেও তৃপ্তি হয় না। ভিজে ভিজে ঠোঁট দুটো সাদা হয়ে ওঠে। মা এসে বকা দেয়। তোয়ালে দিয়ে চুলের গোছা পঁাচাতে পাচাতে বেরিয়ে আসে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ায়। আনুর মা হরলিকস দিয়ে যায়। সালমা খেতে পারে না। কেমন তেতো লাগে। বুকটা

ধড়ফড় করে। নসিয়ার মতো লাগছে। আলমারি ঘেঁটে যা টাকা পায় সব কটি টাকা পার্সে ভরে নেয়। শাড়ি পরতে না পরতে সাকিব এসে হাজির হয়।

দিদিভাই তোর হয়নি? বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছে তোর জন্য।

কেন?

বাবা তোকে ইউনিভার্সিটি পৌঁছে দেবে।

আজকে হঠাৎ।

জানি না।

সালমা থমকে যায়। আজ পরীক্ষা শেষ। বাবা হঠাৎ এমন উৎসাহী হয়ে উঠল কেন? সালমা তো বরাবর রিকশা করে ইউনিভার্সিটি যায়। একবার ভাবল যাবে না বাবার সঙ্গে। আবার ভাবল না থাক। অহেতুক কোনো ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভালো। সুবোধ মেয়ের মতো সালমা বাবার সাদা ড্যাটসানে গিয়ে ওঠে। গাড়িটা গেট পেরিয়ে যাবার সময় সালমা পেছনে ফিরে দেখে মা আর সাকিব বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ও ফিরে তাকাতে মা হাসল। সাকিব হাত নাড়ল। সালমাও হেসে হাত নাড়ল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবা কথা বলছে না। মুখে পাইপ। সালমা ইউনিভার্সিটিতে নেমে যাবার সময়ে বাবা বলল, তিনটের সময় আমি তোমাকে আবার নিতে আসব। তুমি ওই সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থেক।

আচ্ছা।

সালমা আর কথা না বলে চলে যায়। ওর মনে হচ্ছে, ওর অন্তরে আর কোনো রাগ নেই। কোনো ক্ষোভ, কোনো বিদ্বেষ নেই। ও সবকিছু ভীষণ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারছে। সকলের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারছে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ

করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। হলে ঢোকার আগে রকিব একবার কাছে এসে নিচু গলায় বলল, তোকে অপূর্ব দেখাচ্ছে সালমা।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তোর চেহারাটা যেন পাল্টে গেছে।

চেহারা নয়, পাল্টেছে মন। যাকগে, শোন রকিব, আজ যে করে হোক ঠিক দশ মিনিট আগে পরীক্ষার হল থেকে বেরোতে হবে।

বলিস কী? কী ব্যাপার?

ভীষণ জরুরি। তোকে পরে সব বলল। পারবি না বেরোতে?

তোর জন্য কি না পারি?

সুযোগ পেলে বাহাদুরি নিতে ছাড়িস না।

দুজনেই হাসতে হাসতে হলে ঢুকে যায়।

তিনটে বাজার দশ মিনিট আগে সালমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে রকিব। ঘাড়-বাঁকানো তেজি ঘোড়ার মতো দেখাচ্ছে ওকে। এখুনি বুঝি দিগ্বিদিক ছুটবে। সকালের সেই দীপ্র সৌন্দর্যের কমনীয়তা এখনো মুখজুড়ে। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। অথচ আশ্চর্য তার বিকাশ। একই সঙ্গে আগুনের লাল এবং নীল শিখার মতো। একদিকে সৌন্দর্য, অন্যদিকে তেজ।

কী, অমন করে চেয়ে রয়েছিস কেন?

আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সালমা।

বেশি কথা বলার সময় আমাদের নেই।

তুই ভালো করে ভেবেছিস তো সালমা।

সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি না রকিব।

উঃ, সালমা কী যে খুশি লাগছে! আমি এক্ষুনি রাজি।

রকিব ওর হাতে চাপ দেয়। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামতে থাকে।

কিন্তু?

রকিব থমকে দাঁড়াল।

কিসের কিন্তু?

উঠব কোথায়?

এই ঠিকানায়।

সালমা একটা ছোট্ট কাগজ রকিবের সামনে মেলে ধরে। উত্তেজনায় রকিবের হাত কাঁপে। সালমা হাসে। সহজ হাসি। রকিবের মনে হয় এই মুহূর্তে সালমা ওর বুকের সঙ্গে মিশে আছে। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

বিকেলের মধ্যে সব ঘটনা নির্বিবাদে ঘটে যায়। রকিবের কাছে তা স্বপ্নের মতো মনে হয়। সব কাজ শেষ করে ওরা যখন বনানীতে নাসিমা আর সাব্বিরের বাসায় পৌঁছে তখন শেষ বিকেল। লালচে হলুদ আলো ছড়ানো সবখানে। রিকশা থেকে নামার সময় রকিব ওর দিকে তাকিয়ে বলছিল, এখন কেমন লাগছে সালমা?

আকাশে ওড়া পাখির মতো। একদিকে মুক্তির আনন্দ, অন্যদিকে ভালোবাসার স্বাদ।

বাব্বা কত যে ভাবনা।

দুজনে হাসতে হাসতে এসে দরজায় করাঘাত করে। সে শব্দ সালমার বুকে ঘন্টাধ্বনির মতো বাজে।

সাব্বির ওদের দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

আরে সালমা যে? কতদিন পর এলে।

এতদিন পর আমাদের মনে পড়ল তোর। আমি ভাবলাম তুই বুঝি ভুলেই গেছিস।

তোমাকে কী ভুলতে পারি? সালমা ব্রিত মুখে জবাব দেয়।

কী ব্যাপার, তোমাকে অমন জড়সড় দেখাচ্ছে কেন সালমা? দেখো নাসিমা, সালমাকে আজ কেমন একটু অন্যরকম লাগছে।

হ্যাঁ, আমিও তাই দেখছি।

নাসিমা'পা আমি বিয়ে করেছি।

কী বললে? তাই বল। সাব্বির চেঁচিয়ে ওঠে।

বিকেলে বিয়ে হয়েছে। আজ রাতে তোমাদের এখানে থাকব।

তার মানে বাসর? নাসিমা তুমি আয়োজন করো। আমাদের কী ভাগ্য!

উহ চমৎকার! কী খুশির খবর!

নাসিমা সালমাকে জড়িয়ে ধরে। টানতে টানতে শোবার ঘরে নিয়ে যায়। ব্রিত রকিব খুব একটা কথা বলতে পারে না। কেবল সাব্বিরের অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব দেয়।

তারপর নাসিমা আর সাব্বির দুজনে মিলে ওদের জন্য অনেক আয়োজন করে। নতুন শাড়ি কিনে আনে। নতুন প্রসাধনী দিয়ে ওকে। সাজিয়ে দেয়। বিছানায় গোলাপ ছড়িয়ে বাসর তৈরি করে। সালমার ইচ্ছে অনুযায়ী ঘরে লাইটের বদলে মোমবাতি জ্বালায়। বেশি রাত না করে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দাইয়ে দুজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে যায়। ওরা।

সালমা বিছানার ওপর বসে থাকে। গোলাপের গন্ধ ওকে আচ্ছন্ন করে। মোমবাতির শিখা কাপে। মৃদু নীল আলো রোমাঞ্চিত করে ওকে। রকিব ঘরে পায়চারি করে। সারাদিনের সমস্ত ব্যাপারটায় কোনো কিছু ভেবে দেখার অবকাশ ছিল না। উত্তেজনায় অনেকবার ওর হাত-পা কেঁপেছে। এখন সালমা ওর বউ। আজীবনের সঙ্গী। বউ শব্দটা রকিবকে আবার উত্তেজিত করে। ও সালমার পাশে এসে বসে।

সালমা।

বলো।

আমরা এখন কী করব?

তুমি বলো?

আমরা সারারাত জেগে জেগে কথা বলব।

তোমার ক্লান্তি লাগবে না?

একটুও না। আজ তো ক্লান্ত হবার দিন নয়।

তাই।

সালমা হাসে।

কথা বলতে বলতে একসময় কথা বন্ধ হয়। রকিব ঘুমিয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত সালমার ঘুম আসে না। গোলাপের গন্ধ এখনো তীব্র। মোমবাতি জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ। সালমা উঠে জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। বারান্দায় বেরিয়ে এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করে। কখনো ঝুঁকে ঘুমন্ত রকিবের মুখটা ভালো করে দেখে। সারাদিনের উত্তেজনার পর ও এখন শান্ত।

আমি জানি না, তোমার ভালোবাসা আমাকে ধরে রাখতে পারবে কি না রকিব। বাঁধন আমার ভালো লাগে না। আমি হাঁপিয়ে উঠি। তুমি তো জানো, সোজা পথের বদলে চড়াই-উতরাই পথেই আমার সুখ বেশি। আজকের রাতের মতো এমন সুখের ক্ষণ আমার জীবনে বেশি নেই। ওই টুকরো টুকরো ক্ষণগুলো আমার বেহিসারি জীবনের ওপর মিঠে বাতাস বইয়ে দেয়। একটুক্ষণের জন্য শান্তি পাই। আবার যখন পথে নামব, আজকের রাতটা আমি সুগন্ধি পদ্মের মতো আমার হৃদয়ের জলে চিরকালের করে ভিজিয়ে রাখব রকিব। তুমি তার জন্য দুঃখ করো না।

ঘরে ফিরে ও আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। মগজে অস্থিরতা দপদপ করছে। জানালার শিকে কপাল ঠেকায়।

আমি জানি, তুমি এখনো ঘুমোওনি বাবা। ঘুম তোমার আসছে না। তিনটের সময়ে ইউনিভার্সিটি গিয়ে অনেকক্ষণ বসেছিলে। বারবার ঘড়ি দেখছিলে। পাইপ টানছিলে। তোমার সামনে দিয়ে সব ছেলেমেয়ে চলে যাচ্ছিল। আর তুমি অস্থির হচ্ছিলে। একসময় হয়তো নিজে গাড়ি থেকে নেমে ইউনিভার্সিটির চত্বরে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছিলে। পাওনি। তুমি যাকে চোখে চোখে রেখেছিলে, যাকে নিতে এসেছিলে, দেখলে সে নেই। এরকমই হয় বাবা। কিন্তু তুমি তা কোনোদিনও বুঝতে চাওনি। ভাবতে যা তোমার চাই তা তোমার হাতের মুঠোয় পেতে হবে। এটাই যদি সত্য হতো বাবা, তাহলে সোনার হরিণ শব্দটি কেন?

এখন বেশ বুঝতে পারছি আমাকে ভালোবাসার বদলে নিজের আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল তোমার লক্ষ্য। কোথায় সেই ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার সমগ্র জীবনের ওপর ছায়া দিয়ে পাখা মেলে রাখবে? ভালোবাসাই যদি থাকবে তবে আমার জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তোমার ভূমিকা জল্লাদের মতো কেন? কেন ক্ষমতার দাপট আর দম্ভ তোমার আচরণের বড় হাতিয়ার? এতকাল শুধু সবার কাছে নতজান ভক্তি পেয়েছ বলেই আমার আচরণ ছিল তোমার অসহ্য। নিজের মেয়েকে ভালোবাসার বদলে চেয়েছ সেই নতজানু ভক্তি আর দীণ শ্রদ্ধা। সেটা পাওনি বলে তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছিলে। তোমার বিবেকহীন চেতনায় তা ঘা দিয়েছিল। আর তাই তুমি তোমার ভালোবাসাকে আর প্রসারিত করতে পারলে না। ভালোবাসার রাশ টেনে ধরলে। যদি তুমি তা পারতে তাহলে বুঝতাম তুমি জাহিদ চৌধুরী অন্তত একটি জায়গায় নিজের মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছ। পারলে না। দুঃখ আমার নেই। জানতাম তুমি পারবে না। তোমার মানসিকতার প্রতিটি ছিদ্র আমার চেনা, তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে আমি গন্ধ পাই। আমি বুঝি তুমি কী চাও। আমি জানি কতটুকু বললে তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমি জানি কতটুকু ভাবলে তোমার সামনে দেয়াল এসে দাঁড়াবে।

আমাকে তুমি জন্ম দিয়েছ বাবা। সে জন্মের শোধ তুলতে চেয়েছিলে তোমার প্রভুত্বের যাঁতাকলে আমাকে পিষ্ট করে। কিন্তু তুমি কি জানেনা বাবা, যারা দাস হয়ে জন্মায় তারা কোনোদিন প্রভু হতে পারে না? তুমি ওই মূলটা ধরতে পারনি। প্রভু হবার আজীবন সাধনা করে তুমি চিরকাল দাস মনোভাব নিয়ে কাটিয়ে দিলে। যারা চেতনার অন্ধিসন্ধির প্রতিটি ফোকর গলিয়ে ঢুকে ভেতরের চেনাপথ খুঁজে পায় না তারা তোমার মতো বিভ্রান্তি নিয়েই সারাজীবন কাটায়। সেজন্য তুমি মোটেও অনুতপ্ত নও। কেননা ব্যবহারিক চাকচিক্যে তোমার আগ্রহ অনেক বেশি। অবশ্য তুমি পেয়েছেও অনেক। কার্পেট মোড়ানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেছ। আর ওইখানেই আমার যত ঘৃণা।

আমি চেয়েছিলাম একজন শক্তিমান পিতা, একজন মহৎ পিতা। আমি... চেয়েছিলাম... একজন শক্তিমান... বাবা ... যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি নিজের অস্তিত্বকে মহান বলে অনুভব করতে পারতাম। যার আত্মঅহংকার আমার মানস চেতনায় চিরকালের প্রদীপ হয়ে জ্বলত। তুমি তা হতে পারনি। তাই তুমি আমার ওপর তোমার অধিকার টিকিয়ে রাখবে কিসের জোরে? ভালোবাসা নয়, তোমার ঘৃণা নিয়ে আমি দূরে সরে

যেতে চাই। আমি যা করেছি, তার জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই না। কেননা আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পার না। তোমার ব্যর্থতাকে আমি নিজে অতিক্রম করব বলে পথে নেমেছি। তোমার কাছে কোনোদিন পৌঁছবে না আমার সে পদশব্দ।